চৌকাঠ

গুলতেকিন খান

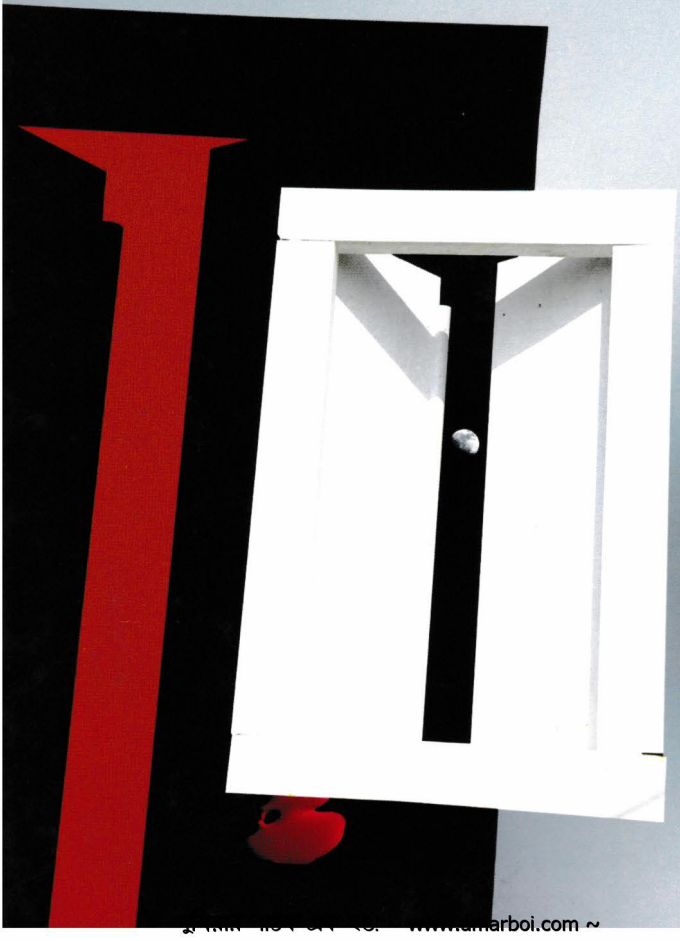

~ www.amarboi.com ~

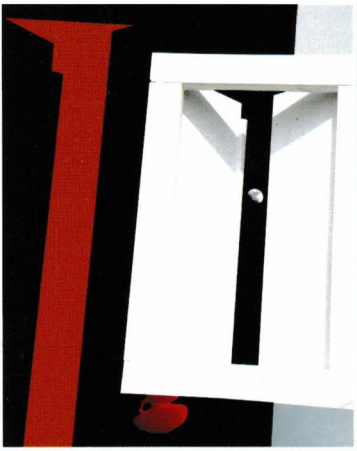

আমাদের প্রত্যেকেরই অন্তত একটি গল্প আছে। সরলরেখাতেই হোক বা বৃত্তাকারেই হোক – এই গল্পগুলি পাশাপাশি অবস্থান না করে জট পাকিয়ে যায় এক সময়। যুক্তি তর্ক বা নিয়ম কানুনের খুব একটা ধার তারা ধারেনা। জীবনকে ছাপিয়ে উঠে ভিন্ন বাস্তব হয়ে যায়।

যে দশ্যমান চৌকাঠগুলি আমাদের চারপাশে দাঁড়িয়ে নিরন্তর পাহারা দিতে থাকে, তাদের ছাড়িয়েও আমাদের থাকে না দেখা অনেক সীমানা। পেছনের ইতিহাস অনিচ্ছায় পেরিয়ে এলেও, আমরা সামনের চৌকাঠে এসে আটকে যাই অনেকেই। অলৌকিক ভাবে স্বপ্নের কুঠুরিতে পা রাখলেও, বাস্তব আমাদের তাড়া করে, রেখে দেয় এদিকটাতেই। আমাদের একজনের কাছে যা স্বাভাবিক আচরণ, অপর একজনের কাছে হয়ে যায় অস্বাভাবিক নিয়তি।

প্রেম আর অপ্রেমের মাঝখানে জেগে থাকে নিরানন্দ এক পথ। রাস্তার এপার থেকে ওপারে যাওয়া সবার জন্যে সহজ হয় না।

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

ঈশ্বরদত্ত আরেফুল্লাহ : কামরুল হাসান মিথুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুলতেকিন খান – সাম্প্রতিক কালের সৃষ্টিশীল লেখকদের একজন। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী গুলতেকিন প্রায় দুই দশক নিভৃতে শিক্ষকতা করেছেন। সামাজিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও স্বল্পভাষী গুলতেকিন সত্যকথন, সৌজন্যবোধ ও সর্বজীবে প্রেমকে সঙ্গে রেখে নিজস্ব শক্তিতে অবিচল আছেন আজীবন। হাতে কলমে প্রমাণ করেছেন বিশ্বস্ততা আর প্রতিভার কোনো অবলম্বনের প্রয়োজন পড়ে না।

সাহিত্যচর্চায় নবাগতা না হলেও গ্রন্থ প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছে গত কয়েক বছর। সাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যমে তিনি পা রেখেছেন অনায়াস নিপুণতায়। বর্তমান গ্রন্থ, প্রথম উপন্যাস 'চৌকাঠ' ছাড়াও তাঁর অপর চারটি গ্রন্থ – 'আজো, কেউ হাঁটে অবিরাম' (কাব্যগ্রন্থ, ২০১৬), 'দূর দ্রাঘিমায়' (অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ, ২০১৭), 'মধুরেণ' (সতীর্থ কবি আফতাব আহমদ-এর সঙ্গে যৌথ কাব্যনাট্য, ২০১৭) ও 'আলো আঁধারের গল্প' (শিশুতোষ গ্রন্থ, ২০১৮) পরিশীলিত পাঠকদের মনে জায়গা করে নিয়েছে।

Facebook:
https://www.facebook.com/Threshold-চৌকাঠ
Email: threshold-novel@gmail.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৌ কা ঠ

চৌকাঠ

গুলতেকিন খান

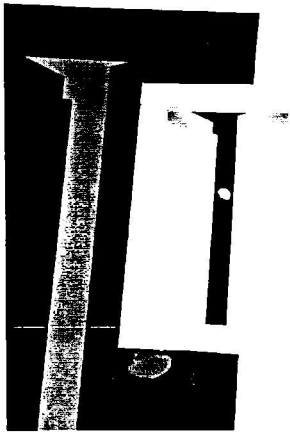

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৌকাঠ

গুলতেকিন খান

তাম্রলিপি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৌকাঠ
গুলতেকিন খান

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৮

তাম্রলিপি : ৪৬৬

পরিচালক
তাসনোভা আদিবা সেঁজুতি

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/৪, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
জননী প্রিন্টার্স
১৯নং প্রতাপ দাস লেন, ঢাকা-১১০০।

মূল্য ২০০.০০

THRESHOLD (CHOUKATH)
By Gultekin Khan
First Published February 2018, by A K M Tariqul Islam Roni
Director : Tasnova Adiba Shanjute, Tamralipi, 38/4, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : 200.00 $ 10

ISBN- 978-984-8058-17-6
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উ ৎ স র্গ

বাবা আসাদুজ্জামান খান,
মা কোহিনুর খান,
বড় বোন তাহসিনা খান,
ও ভগ্নিপতি গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবসরপ্রাপ্ত)
মো. শামসুজ্জোহাকে,
শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংবিধিবদ্ধ ঘোষণা

এ বইয়ের সব নাম, চরিত্র ও ঘটনা কাল্পনিক।
বাস্তবের জীবিত বা মৃত কারো সঙ্গে
এদের মিল সম্পূর্ণ কাকতালীয় ও অনিচ্ছাকৃত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নোমান চৌধুরী সারারাত তাঁর মৃত স্ত্রীর পাশে শুয়ে ছিলেন।

ঘটনাটি এমন হবার কথা ছিল না। একদিনের মধ্যে সবকিছু এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। এর জন্যে দায়ী সুমনা চৌধুরী। দায়ী না বলে বলা উচিত তাঁর জন্যে অনেক কিছু বদলে গেছে, অবশ্য এর মধ্যে নোমান চৌধুরীও কিছুটা জড়িয়ে আছেন। একটা বি এম ডাব্লিউ গাড়ি যদি দেড় যুগ পার হবার পরও ঝকঝকে নতুন গাড়ির মতন চলে, ইঞ্জিনে কোনো সমস্যা ধরা না পড়ে, ঠিক তিন মাস পরপর সার্ভিসিং করানো হয়, ব্রেক শু কয়েকবার পাল্টানো হয়, তাহলে ড্রাইভারের কী দোষ?

গাড়ি চলে 'স্মুদ অ্যাজ সিল্ক'। একদিন উত্তরা থেকে ধানমন্ডি যাবার পথে বিজয় সরণির শেষ মাথায় হঠাৎ থেমে যায় গাড়িটি। কোনো কিছুতেই স্টার্ট নেয় না। মেকানিক এসে বলে "এত পুরান গাড়ি এইটার মধ্যে আর কিছুই নাই, ভিত্‌রে ভিত্‌রে গ্যানজামের ডিব্বা হইয়া আছিল স্যার, উপরের থিক্যা বুঝা যায় না।" ড্রাইভার তখন বোকার মতন দাঁড়িয়ে থাকে একপেয়ে সারসের মতো।

হ্যাঁ, তাই ঘটেছে সুমনা চৌধুরীর বেলায়। দিব্যি ভালো মানুষ, কোনোদিন জ্বর-সর্দি ছাড়া বড় কোনো অসুখ হয়নি। তাঁর ছিপছিপে দেহের গড়ন দেখে কেউ বুঝতেও পারত না যে তাঁর বড় বড় দুজন ছেলে আছে এবং ছেলেদের একজনের বাচ্চাও আছে। তাঁকে অনায়াসে ত্রিশ-বত্রিশ অথবা বড় জোর চল্লিশ বছর বলে চালানো যেত। অথচ তাঁর আসল বয়স ছিল বায়ান্ন বছর। মুখে সব সময় একটা মিষ্টি হাসি লেগে থাকত। কখনো উঁচু গলায় কথা বলতেন না। একটা প্রাইভেট কলেজে ইতিহাস পড়াতেন।

কিন্তু সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। রাতে নোমান সাহেবের সাথে গল্পও করেছিলেন। অথচ ভোরবেলায় তাঁর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। ভোরে তাঁরা দুজন নিয়মিত হাঁটতে যেতেন। তিনি নোমান চৌধুরীকে ঘুম থেকে জাগাতেন। সেই ভোরে তিনি আর নোমান চৌধুরীকে ঘুম থেকে ওঠাননি।

নোমান চৌধুরী মৃত মোনার (তিনি সুমনা চৌধুরীকে মোনা বলে ডাকতেন) পাশে শুয়ে ছিলেন দীর্ঘ সময়। আটটার দিকে যখন ফুলি বুয়া নাশতার জন্যে ডাকতে এল তখনই বোঝা গেল যে মোনা আর নেই। তাঁর দুই ছেলে সায়ান আর আয়ান অ্যামেরিকা থেকে চলে এল। তার আগে পর্যন্ত বারডেমের হিমঘরে তাকে রাখা হলো।

নোমান চৌধুরী এতটাই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন যে কয়েক দিন পুরোপুরি কথা বন্ধ করে ছিলেন। দুই ছেলেকে দেখেও তাঁর মুখে কোনো ভাবান্তর হয়নি। দু সপ্তাহের মধ্যে তাঁর ম্যাসিভ একটি স্ট্রোক হলো। একটি প্রাইভেট হাসপাতালের আইসিসিইউতে দশদিন থেকে যখন বাড়িতে ফিরলেন তখন তাঁর দুটো হাত এবং পা প্রায় অকেজো হয়ে পড়েছিল। ভাগ্যিস সায়ান আর আয়ান তখনো দেশে ছিল। তারা হাসপাতালের ফিজিওথেরাপিস্টকে বাসায় এনে বাবার হাতের ও পায়ের চিকিৎসা শুরু করে দিল এবং সেই সঙ্গে রহমত নামের লোকটিকে ময়মনসিংহ-এর হারাকান্দির টিপরা গ্রাম থেকে নিয়ে এল বাবার দেখাশোনার জন্য।

নোমান চৌধুরী ব্যাপারটি একেবারেই পছন্দ করেননি। যে ঘরে তিনি মোনাকে নিয়ে থাকতেন সেখানে লম্বা কালো লুঙ্গি পরা গন্ডগ্রামের একটা লোক চব্বিশ ঘণ্টা বসে থাকবে? কিন্তু তাঁর তখন কথা বলার মতন অবস্থা ছিল না, তাই ছেলেদের কথাই মানতে হয়েছিল তাঁকে।

থেরাপিস্ট লোকটা বেশ ভালো ছিল, ছয় মাসের মধ্যেই তিনি হাত ও পায়ের ব্যবহার কিছুটা শুরু করতে পারলেন। প্রথমদিকে প্রতিদিন এলেও তারপর থেকে সপ্তাহে চারদিন আসত। তাঁর কোমরে সুমনা চৌধুরীর পুরোনো শাড়ি পেঁচিয়ে বিছানা থেকে নামিয়ে বলে—"চাচা, একটু হাঁটার চেষ্টা করুন তো। ভয়ের কিছু নাই, আমি এটা ছাড়ব না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নোমান চৌধুরী একপা-দুপা করে হাঁটতেন। এখন প্রায় পুরোপুরি হাঁটতে পারেন, খেতেও পারেন নিজে নিজে। কিন্তু নিজের ভেতর থেকে সুস্থ হবার তেমন কোনো উৎসাহ পান না। কী হবে সুস্থ হয়ে? তার মোনা কি আর ফিরে আসবে, কার জন্যেই বা তিনি বাঁচবেন?

তিনি পাশের বালিশে হাত রাখেন, এখানে মোনা ঘুমাত। তিন বছর হয়ে গিয়েছে এখনো তিনি মোনার চুলের মিষ্টি গন্ধ পান এই বালিশে।

ব্যাপারটি মোটেও বিশ্বাসযোগ্য নয়। তিন বছর আগে ডাক্তাররা যাকে মৃত বলে ঘোষণা করেছিলেন তাঁর গন্ধ কীভাবে থাকে? এই বিছানা ও বালিশের কভার সপ্তাহে দুদিন ধোয়া হয়। এ বালিশে বড়জোর সাবানের গন্ধ থাকতে পারে। কিন্তু বেচারা নোমান চৌধুরীকে এসব বাস্তবসম্মত কথা কে বলবে! কাজেই ধরে নিই সুমনা চৌধুরীর চুলের গন্ধ এ বালিশে আছে।

কখনো কখনো মাঝরাতে ঘুমের মধ্যে নোমান চৌধুরী মোনা মোনা বলে ডাকেন। ভুলে যান যে মোনা তড়িঘড়ি করে তাকে একা ফেলে গেছেন। তখন রহমত মিয়া এগিয়ে এসে বলে, "খালুজান, কিছুতা লাগতো?"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রহমত মিয়া সিঁড়িতে বসে বিড়ি খায় আর চিন্তা করে। মাঝে মাঝে চিন্তাগুলো দার্শনিকদের মতন মাথায় ঘোরে। যেমন এই মুহূর্তে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল—"এই একই আকাশের নিচে কত জাইতের মানুষ! কেউ কালা, কেউ ধলা। কেউ চুর, কেউ মাতবর! এরার মধ্যে কার মনে যে কী আছে বুঝার কোনো উপায় নাই। এই যে আমি এইহানে বইসা আছি কুনুদিনও কি ভাবছি নিজের গেরাম ঘর ছাইড়া এইরহম রাজাদের মতন বাসায় থাকুম?"

আকাশের সূর্যটা পশ্চিমদিকে হেলে পড়েছে, হালকা বাতাস বয়ে যাচ্ছে। বাগানের গাছগুলো দুলে দুলে উঠছে। "কী আজিব জিনিস আল্লায় বানাইছে! আমাগোর গেরাম থেইকাও এই একই সূর্য একই চাঁন্দ দেহা যায়। এইহানে আমি রাজার লাহান আছি। বুইড়ার বড় পুতে একটা ফুন কিনা দিছে। দুইডা ছাওয়ালই পিত্যেকদিন ফুন করে। ছাওয়াল দুইটা ভালা আছে। তাগো বাপের দেখভাল করনের জন্যে আমারে আনছে।"

সে সামনের দিকে তাকায়। কত রঙের ফুলে যে বাগানটা ছেয়ে আছে। "এই ম্যানেজার ব্যাটায় আইলেই চোখ ইশারায় ঘরের বাইরে যাইতে কয়। কী গুপন কতা যে কয় আল্লায় জানে। বাড়িটা বড়ই সোন্দর।" বিড়বিড় করে রহমত। সে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামে।

বাড়ির মালি জালাল লম্বা কাঁচি দিয়ে ঝোপের এবড়োখেবড়ো অংশ সোজা করে ছাঁটছিল আর নিজের মনে গুনগুন করছিল—

"ও আমি একাতো করিনি চুরি.
আমার সঙ্গে ছিল ছয় জনা..."

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গানটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনল রহমত মিয়া, তারপর বুকপকেট থেকে বিড়ির প্যাকেট বের করে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল–

"ও মালি ভাই, বিড়ি খাইবেননি?"

"না। তোমারে না কইছি জালাল ভাই ডাকতে?"

"মনে আছিল না। মাফ কইরা দিয়েন।" রহমত তার ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসে। এবার সে আর ভুল করে না। বলে,

"এত জাতের ফুল! জালাল ভাই আপনে সব গুলাইনের নাম জানেন?"

গাছের পাতা ছাঁটতে ছাঁটতে গম্ভীর হয়ে জালাল বলে–

"জানতাম না কেন, কত বছর ধইরা কাম করি জানো? স্যারেরে একা রাইখা এইখানে কী করো?"

"খালুজান একা না। ওই ম্যানেজার ব্যাটা ঘরে আছে। হেই আমারে বাইরে আসতে কইছে।"

"আবার কও ব্যাটা! কইবা ভদ্দরলোক, বুঝলা?"

"আইছ্ছা। আমি ইকটু রাস্তা থিইকা ঘুরান দিয়া আসি। ম্যানেজার ভদ্দরলোক নামলেই আমারে ডাইকেন।" রহমত মিয়া গেট খুলে রাস্তায় হাঁটতে শুরু করে।

রাস্তার আইল্যান্ডে লাল কৃষ্ণচূড়া দেখে তার মনটা উদাস হয়ে যায়। মায়ের কথা মনে পড়ে খুব। কতদিন তারা দুজন না খেয়ে থেকেছে। এ বাড়ি সে বাড়ি ঘুরে ঘুরে তার মা কাজ করত। কাজ থাকলে ভাত জুটত, আর যখন কোনো কাজ পেত না তখন তাদের খারাপ দিন শুরু হতো। রহমত বলত–"মা, খিদা লাগছে। ঘুম আহে না।"

"এক গেলাস পানি খারে বাবা। তাইলে প্যাটটা একটু ভরব।" রহমত উঠে পানি খেত কিন্তু পেট ভরত না। চেয়ারম্যানের বাসায় কাঁঠাল চুরি করত রাতে। তারপর মুড়ি জোগাড় করে কাঁঠাল দিয়ে খেত। চুরির জন্য মারও খেতে হয়েছে অনেক। পুকুর থেকে শাপলা ফুল আনলে তাঁর মা খুব মজা করে রান্না করত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুক্রবার চৌধুরী বাড়িতে জুমার পর ফকির মিসকিন খাওয়াত। রহমত সবচেয়ে আগে গিয়ে কলাপাতা নিয়ে বসে থাকত। খিচুড়ির সঙ্গে মুরগি অথবা গরুর মাংস, সঙ্গে আবার সবজি। কী যে মজা ছিল সেই খাওয়া। রহমতের পেট ভরে গেলে দ্বিতীয় কিস্তি পরিবেশনের জন্য বসে থাকত। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে দ্বিতীয়বারও খাবার পেত। আর সেটা সে মায়ের জন্য নিয়ে যেত।

বেশিদিন পায়নি মাকে। জন্ডিসে হলুদ হয়ে রোকেয়া, নয় বছরের রহমতকে রেখে না-ফেরার দেশে চলে যায়। বাবাকে তো চোখেই দেখেনি। এই দুঃখ তার কোনো দিন যাবে না। মৃত্যুর আগে আগে মা তাকে তার বাবার সম্পর্কে কিছু কথা বলেছিল। তার বাবার নাম ছিল মনসুর মিয়া, কিন্তু লোকজন তাকে ডাকত চোরা মনসুর। ও নামটা যাতে রহমতের শুনতে না হয় সে জন্য তার মা তাকে বগুড়া থেকে রহমতের নানাবাড়িতে নিয়ে চলে এসেছিল। কেমন করে মনসুর মিয়া মারা যায় তাও বলেছিল।

মা মারা যাবার পর থেকে নিজেই বিভিন্ন বাসায় টুকটাক কাজ করে পেট চালাত। চৌদ্দ বছরেই সে বিশাল বড় হয়ে গিয়েছিল। তখন আর তার কাজের অভাব ছিল না। কারো নতুন ঘর তোলা, খেজুরগাছ থেকে রস নামানো, মাছ ধরা—এ ধরনের কাজে সব সময় রহমতের ডাক পড়ত। উঁইপোকার বাসা ভেঙে ছোট ছোট বলের মতন বানাত। তারপর সেগুলো ছিপে লাগিয়ে মাছ ধরত।

ষোল বছরের মাথায় রহমত হঠাৎ একদিন জরিনা সুন্দরীর বাবাকে গিয়ে বলল যে সে তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। জরিনা সুন্দরীর বাবা খুবই অবাক হন রহমতের সাহস দেখে। তিনি রহমতকে বিশেষ স্নেহ করতেন, তাই রাজি হয়ে যান।

"আমারে কিন্তুক একটা মুদি দোকান কইরা দিতে হইব। নাইলে আপনার মাইয়ারে খাওয়াইতাম কী?" রহমত বেশ আবদারের সুরে বলেছিল। জরিনা সুন্দরীর বাবা শুধু দোকান করেই দেননি, সাজিয়েও দিয়েছেন। কয়েক রকমের বিস্কিট, লজেন্স, সাবান, চিনি, লবণ, দাঁতের মাজন, চিড়া-মুড়ি, চানাচুর, আদা-রসুন-পেঁয়াজ, তেল, চা পাতা—আরো কত কী যে ছিল! সবচেয়ে ভালো ছিল একটি কেরোসিনের স্টোভ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেতলি আর ছয়টা চায়ের ছোট গ্লাস। দোকানের সামনে একটা বেঞ্চ ছিল, যাতে লোকে বসে চা খেতে পারত। বাসার সঙ্গেই লাগানো ছিল দোকান, রাস্তার ধারেই।

রাতের বেলা ছাড়া কোনো কোনো দুপুরেও জরিনা সুন্দরীকে বিছানায় নিয়ে আদর করত রহমত। জরিনার নরম বুকে মাথা রেখে গন্ধ শুঁকত। জরিনা সুন্দরী কোনোদিনই না করেনি। হাসিমুখে সেও অংশগ্রহণ করত। এক বছরের মাথায় তার কোল জুড়ে এসেছিল মতিন আলী ওরফে মতি। মতি তার মায়ের সৌন্দর্যের কিছুটা পেয়েছিল। কিন্তু দেড় বছরের মতিকে রেখে তার মা চেয়ারম্যানের ছেলের সঙ্গে পালিয়ে যায়।

রহমত অবাক হয়নি, তার সঙ্গে যে আড়াই বছরের মতন ছিল জরিনা সুন্দরী তাতেই সে অবাক হয়েছে। বরং তার ভয় ছিল জরিনা সুন্দরীর বাবা এসে যদি দোকান নিয়ে যায়, সেটা নিয়ে। মতিকে দোকানের এক পাশে বসিয়ে রেখে সে কাজ করত। রহমতের কাছে সবচাইতে প্রয়োজনীয় বস্তু হলো ভাত। পেট ভরা থাকলে এর চেয়ে শান্তির আর কিছু নাই।

জরিনা সুন্দরী পালানোর পর থেকে তিন বেলা ভাত খাওয়া একটু কঠিন হয়ে পড়েছিল। জরিনার রান্নার হাত ভালো ছিল। দোকান আর মতিকে নিয়ে রান্না করতে খুব ঝামেলা হতো রহমতের। পরে পারুল এসে রান্না করে দিয়ে যেত। পারুল তার ছোটবেলার খেলার সঙ্গী, বিয়ে হয়েছিল এক বৃদ্ধের সঙ্গে। বৃদ্ধের চার নম্বর বউ ছিল সে। বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই বুড়ো পরপারে রওয়ানা হয়ে যায়। এরপর পারুল আর ও বাড়িতে থাকতে পারেনি। বুড়োর প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়েরা ছিল তার চেয়েও বয়সে বেশ বড়। একা পেলেই আগের ঘরের ছেলেগুলোর নজর কেমন যেন হয়ে যেত। আর মেয়েগুলোর সমস্যারও কমতি ছিল না। কোনো মতেই যাতে বুড়োর সম্পত্তির ভাগ তার কপালে না জোটে সেটাই ছিল তাদের দিন রাতের চেষ্টা।

পারুলের বাবার বাড়িটা খুব একটা ছোট ছিল না। চার ঘরের একটা বাবা তার নামে লিখে নিয়েছিল। পারুলের ঘরের পাশেই তার বাবার ঘর। পরের ঘর দুটোতে তার ভাই বউ বাচ্চা নিয়ে থাকত। বাসার পেছনে পাকের ঘর আর নিজস্ব টিউবওয়েল। জরিনার মতন সুন্দরী না হলেও সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখতে মন্দ ছিল না। সাপের মতন এঁকেবেঁকে হাঁটত সে, আর তার শরীরের ঢেউগুলোও সবার চোখে পড়ত।

"ও রহমত, রান্ধা শেষ। আমি তাইলে গেলাম।" কিন্তু সে যেত না। রহমত এসে জিজ্ঞেস করত–

"কী রানলা গো সুন্দরী বন্ধু?" সঙ্গে সঙ্গে তার হাতও পারুলের শরীরের এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করত। পারুলও বিড়ালের মতন তার আদর খেত।

এক রাতে মতিকে নিয়ে ঘুমানোর সময় রহমতের মনে হলো মতি ঘুমাচ্ছে না। তার বয়স তখন পাঁচ বছর।

"কীরে মতি ঘুমাস না কেন?"

"ঘুম আয় না বাজান। তুমি কি আবার বিয়া করবা?"

"কেডায় কইছে তোরে?"

"হগলেই কয় পারুল খালারেই বিয়া করবা। এমন জোয়ান মর্দ নাকি মাইয়া মানুষ ছাড়া থাকতে পারে না। আর বিয়া করলে তো হেয় আমার সতাই মা হইত। আমারে খাওন দিত না।"

এটুকু ছেলের কথায় রহমত বড়ই লজ্জা পায়। ভাবে–"পারুলের লগে আমারে দেখছে নাকি?" মুখে বলে–

"কাছে আয়রে গ্যাদা। মাইনষের কথা কানে লইস না। আমি আর বিয়া করুম না।" মতির পিঠে হাত বুলায় রহমত।

সে কথা রাখতে রহমত আর বিয়ে করেনি। ৩৮ বছরের শরীরে রক্ত টগবগ করে, তার দেহ মাঝে মাঝেই একজন নারীর কোমল স্পর্শের জন্য গন গন করে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রহমত মিয়া সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই দেখে ম্যানেজার চলে যাচ্ছে। সে ঘরে ঢুকে বলে–

"খালুজান কিছুতা লাগত?"

"তুমি আবার বিড়ি খেয়েছ রহমত, তোমাকে না কতবার বলেছি বিড়িটা বাদ দিতে! শরীরের জন্য খুব খারাপ।" নোমান চৌধুরী কিছুটা অধিকারের ভঙ্গিতে বলেন।

"আমি খাই নাই খালুজান। ওই মালি খাইতেছিল। আমি দুইটা টান দিছি খালি, মুখটা ধুইয়া আসি।" অনায়াসে মিথ্যে বলে রহমত মিয়া।

প্রথম দিন থেকেই আবলুশ কালো এই লোকটিকে ভালো লাগেনি নোমান সাহেবের। বসে থাকলে কালো কাঠের মূর্তির মতন লাগত। হাসলে ধবধবে সাদা দাঁত যেন পলিশ করা মার্বেলের মতো। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করত পৌষের কয়লার আধারের মতো।

তবে এখন আর তেমন লাগে না। একধরনের মায়া জন্মে গেছে। তিনি যখন একেবারেই হাঁটতে পারতেন না তখন রহমত মিয়া রাত জেগে পাহারা দিত। তাঁর কাজে কোনো ফাঁকি ছিল না। নোমান চৌধুরী ডাকলেই তাঁকে ধরে নিয়ে বাথরুমে নিয়ে যেত কিংবা চাইলেই পানি এনে দিত। তখনো নোমান সাহেব সায়ান ও আয়ানকে কাছে ডেকে ফিসফিস করে বলতেন–

"দেখ দেখ, চোখদুটো দেখ। কেমন খুনি খুনি লাগে না? গায়ে কেমন একটা বোঁটকা গন্ধ। তোমরা ওকে ওর গ্রামেই রেখে আসো।" সায়ানের স্ত্রী ইরিন, কয়েকটা লুঙ্গি-শার্ট, টুথপেস্ট আর ব্রাশ কিনে দিয়েছিল রহমত মিয়াকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাস ছয়েকের মধ্যেই তাদের মধ্যে একধরনের সখ্যতা গড়ে ওঠে। এবং সেটা রহমত মিয়ার কারণেই। উনি যখন 'দি ইকোনমিস্ট'-এর পাতা পড়ার চেষ্টা করছেন তখন রহমত মিয়া এসে বলত–

"খালুজান, কিতা করতাছুইন?"

"তেমন কিছু না। একটা ম্যাগাজিন পড়ি আরকি।"

"কী জিন কইলেন?" আঁতকে উঠে রহমত মিয়া এক পা কাছে চলে আসে।

"জিন না, ম্যাগাজিন।"

"এইতার মধ্যে কী লেখা থাকে?"

"অনেক রকম খবর থাকে।"

"আপনার বালা লাগে পড়তে?"

"অনেক দিনের অভ্যাস তো। ভালোই লাগে পড়তে!"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশি ড্রেসিং টেবিলের সামনে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে সাজছে। নীল রঙের শাড়িতে বেশ লাগছে ওকে। পিঠের ওপর একটা লম্বা বেণিও সঙ্গে সঙ্গে দুলছে। ছোটবেলায় ওকে তেমন সুন্দর লাগত না। যতই দিন যাচ্ছে রাজহংসীর মতন সুন্দর হয়ে উঠছে নিশি। অয়ন মুগ্ধ হয়ে দেখে ছোটবোনকে।

"আচ্ছা, বাবা-মা কী দেখে এমন ঝকঝকে মেয়ের নাম নিশি রেখেছিল?" বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবে অয়ন। হঠাৎ নিশি ভাইয়ের দিকে ফিরে বলে–

"দেখ তো কোন টিপটাতে বেশি ভালো লাগছে, কালো নাকি নীল?" নিশি দুই রঙের টিপ পরে দেখায়।

"কালোটাতে বেশি ভালো লাগছে।" অয়ন চাদর থেকে মুখ বের করে বলে। "তুই এমন গোয়েন্দা হলি কবে থেকে?"

"বড় ভাইরা যখন লুকিয়ে লুকিয়ে বোনেদের সাজ দেখেও চুপ করে থাকে তখন থেকে।" হাসতে হাসতে বলে নিশি, "আজ তোর ক্লাস নেই? শুয়ে আছিস যে?"

"আছে। বারোটায়। সকালেরটা ক্যান্সেল হয়ে গিয়েছে।" বিছানা থেকে নামতে নামতে বলে অয়ন।

এইচএসসির পরপর পাগলের মতন পড়ত অয়ন। পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে চান্স না পেলে ওর পড়া থেমে যাবে। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ার খরচ দেয়ার ক্ষমতা ওদের পরিবারের নেই। তাই পরীক্ষা দিয়েছিল সব জায়গায়। ঢাকা ইউনিভার্সিটি-বুয়েট-ঢাকা মেডিকেল কলেজ-আর্ট কলেজ, এমনকি সিলেটের শাহজালাল

AMARBOI.COM

ইউনিভার্সিটিতেও পরীক্ষা দিয়ে এসেছিল। ঢাকা ইউনিভার্সিটি ও বুয়েটের প্রথম সারিতে ওর নাম ছিল।

রেজাল্ট দেখতে গিয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না সে। পাশের একজন অচেনা ছেলেকে বলেছিল—

"আপনি কি কাইন্ডলি আমার রোল নাম্বারটা আছে কি না দেখবেন? আমার চোখে একটু সমস্যা আছে।" সেই ছেলেও বোধ হয় তার নিজের রেজাল্ট দেখতে এসেছিল। কিছুক্ষণ পর তার কাগজটা ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিল—

"আপনি তো ভাই প্রথম বিশ জনের ভেতরে আছেন। কংগ্রাচুলেশন!" ফেরার পথে বারবার চোখ মুছছিল অয়ন।

এবার সে ফাইনাল ইয়ারে আছে। যদিও অয়ন এ বছর প্রথম থেকেই ক্লাস করছে না। আর কয়েক মাস পরেই তার ফাইনাল পরীক্ষা। প্রথম কয়েক বছর অয়ন সবচেয়ে বেশি নাম্বার পেয়েছিল, গড়ে প্রায় সিজিপিএ চার। সব স্যারের ওকে নিয়ে অনেক আশা ছিল। কিন্তু ফাইনাল ইয়ারে ওঠার পর ও বুয়েটে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। এর মধ্যেই সে টোফেল, জিআরই দিয়েছে। স্কোরও ভালো। বাইরের কয়েকটা ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্সে ভর্তি হবার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। দুবছর ধরে টিউশনির টাকা থেকে কিছু সরিয়ে রেখেছে। যদি কোনো জায়গা থেকে অফার আসে তখন তো টিকিট কিনতে হবে। যদিও যা জমিয়েছে তাতে টিকিটের অর্ধেকও হবে কিনা সন্দেহ। তবে ওর মন থেকে দেশের বাইরে যাওয়ার একদমই ইচ্ছে নেই।

অয়নের সমস্ত স্বপ্ন লেখালেখি নিয়ে। ক্লাস নাইন-টেন থেকেই সে ছোটগল্প লেখে। ওর সব ভালো লাগা আর ভালোবাসা নিজের লেখালেখিকে ঘিরে। তার সব সময় মনে হয়—ভালো ছাত্র তো অনেকেই হতে পারে, কিন্তু ভালো লেখক ইচ্ছে করলেও হতে পারে না। এ দেশে ভালো লেখকের সংখ্যা খুব কম। ক্লাস বাদ দিয়ে সে বাংলাবাজারে বিভিন্ন প্রকাশকদের সাথে কথা বলে। তবে সব সময়ই হতাশ হয়। কেউ নতুন লেখকদের বই ছাপতে চায় না। ভেবেছিল প্রকাশক পেলেই মাথার ভেতরের কাহিনীটা লেখা শুরু করবে। শেষ পর্যন্ত প্রকাশক ছাড়াই লেখা শুরু করতে থাকে। তাও হতাশ হয়নি অয়ন, ভেঙে পড়েনি। লেখালেখি নিয়ে অয়নের এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসাহের সমস্ত ক্রেডিট সোনাদাদুর পাওনা। উনি তাঁকে পড়তে শিখিয়েছেন। ওনার বাসায় একটি বিশাল লাইব্রেরি আছে। অয়ন যখন ক্লাস ফোরে পড়ে, তখন থেকেই সোনাদাদু ডেকে ডেকে ইংরেজি বই পড়ে শোনাতেন। উনি বলতেন–

"ইংরেজিটা ভালো করে শিখে নে দাদুভাই। পৃথিবীর প্রায় বেশির ভাগ সেরা লেখাগুলো সব ইংরেজিতেই লেখা। যেসব দেশের মাতৃভাষা ইংরেজি না সে দেশগুলোর সেরা লেখাগুলোও ইংরেজিতে অনুবাদ করা।"

উনি অয়নের পড়ার উৎসাহ দেখে প্রতিদিন তাকে আধ ঘণ্টা করে ইংরেজি পড়াতেন। সোনাদাদু যদি ওকে ইংরেজি না শেখাতেন তাহলে অয়ন হয়তো মূর্খ হয়ে থাকত। ক্লাস সেভেনেই সে দ্য ওল্ড ম্যান এন্ড দ্য সি পড়েছে। সোনাদাদুর ঋণ সে কোনোদিনই শোধ করতে পারবে না।

অথচ নিজের বাবা থেকেও না থাকার মতন। এমন ধান্দাবাজ লোক আর কখনো দেখেনি সে। এজি অফিসের কেরানি অথচ কোনো কারণে টাকা প্রয়োজন হলেই বলেন যে একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। তাঁর এই দুই নম্বরি টাকার প্রতি তাঁদের তিন ভাই-বোনের কোনো আগ্রহ নেই। মা-য়েরও এসব পছন্দ না। বাবা নিজের টাকা জুয়া খেলে নিজেই ওড়ান। ছেলেমেয়েরা কী করছে তা নিয়ে কোনো চিন্তা নেই বা জানেনও না।

আগে মা খাবার নিয়ে জেগে থাকত। কিন্তু এখন অয়নই জেগে থাকে। অয়ন হাত-মুখ ধুয়ে দেখে বাবা উঁচু করে লুঙ্গি পরে বাসার লনে হাঁটছেন আর একটি মাজুনি দিয়ে দাঁত মাজছেন। "এত সুন্দর একটা লনের মধ্যে কীভাবে কেউ মাজুনি দিয়ে দাঁত মাজতে পারে?" ভাবে অয়ন। অয়ন রান্নাঘরের দিকে রওনা হতেই নিজাম সাহেব ডাকেন ওকে।

"ও খোকা, এদিকে আয় তো একটু।" অয়ন বিরক্তি চেপে বাবার কাছে যায়।

"কী সুন্দর গোলাপ ফুল ফুটেছে দেখেছিস?" বলেই তিনি একটা লাল গোলাপ ছিঁড়ে ফেললেন। "এটা নিশিকে দিয়ে আয়। ওর শাড়ির সাথে ভালো মানাবে।"

অয়ন ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকায়, এ বাড়ির মালি, জালাল চাচা দেখলে সর্বনাশ হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বাবা কতবার না তোমাকে ফুল ছিঁড়তে মানা করেছে জালাল চাচা?"

"আরে ধুর। ও জানতেই পারবে না। যা যা এটা নিশিকে দিয়ে আয়।"

অয়ন ফুল নিয়ে প্রায় দৌড়ে ঘরে ঢুকে নিশিকে খোঁজে। তাকে পাওয়া যায় রান্নাঘরে, আলুভাজি আর আটার রুটি দিয়ে নাশতা করছে।

"নে, তোর জন্যে বাবা এটা চুরি করেছে।"

"আমার জন্য না। সে ফুল ছিঁড়েছে নিজের আনন্দের জন্য। কী যে করে এই লোক! মা তুমি কেন কিছু বলো না? একে অন্যের বাসায় আছে, তার ওপর আবার ফুল ফল চুরি করে এনে ঘর ভর্তি করছে।" নাজমা ভ্রু কুঁচকে ভাবেন–

"আমার স্বামী আমার কথায় উঠবে বসবে? তোরা তোদের বাবাকে চিনিস না? আমার আর এইসব ভালো লাগে না।"

অয়নও বসে যায় নাশতা খেতে। "আসলেই মা কী করবে?" মনে মনে ভাবে অয়ন।

আজকেই রাহাতের সাথে দেখা হবে নিশির। তাই সকাল থেকেই মনটা খুব ভালো হয়ে আছে। রাহাত ওর ছেলেবেলার বান্ধবী মুনিয়ার বড় ভাই। একসময় নিশি খুব নাচ শিখতে চেয়েছিল। মাকে বলার সঙ্গে সঙ্গে মা প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে থামিয়ে দেন মেয়েকে।

"তুই নাচ শিখবি–পরে বড় হয়ে কী করবি? তোকে নাচ শেখানোর মতন গাদা গাদা টাকা আমার নেই।"

তখন মুনিয়া নাচ শিখত। আর তার মনের কথা মুনিয়াকে সে বলেছিল। সামনে ছিলেন মুনিয়ার মা মেহরিন। তিনি বললেন–

"তুমি মুনিয়ার সাথে নাচ শেখো। শুধু তো শুক্র আর শনিবার। তোমার মা কিছু জানতেও পারবেন না।"

সেই তখন থেকেই মুনিয়ার সাথে নিশির নাচ শেখা শুরু। তখন মাঝে মাঝে রাহাতের সাথে দেখা হতো তার। সে তাদের নাচ নিয়ে অনেক ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ করত। এভাবে যে কোন সময় তারা দুজনের খুব কাছাকাছি চলে এসেছিল তা তারা বুঝতেও পারেনি।

নিশিকে তার মায়ের আদর্শ মেয়ে বলা চলে না মোটেই। মা অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু নিশি সেসব পাত্তা দেয়নি। ভাইয়াকে দেখে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল। অন্য ছেলেরা যখন মাঠে গিয়ে খেলাধুলা করত, সিনেমা হলের সিনেমা দেখত, আড্ডা দিত, ভাইয়া তখন বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকত। মা যা বলতেন ভাইয়া তা-ই করত।

নিশি জীবনটাকে তার নিজের মতন উপভোগ করতে চায়। এসএসসিতে সে টেনেহিঁচড়ে সেকেন্ড ডিভিশন পেয়েছিল। এইচএসসিতেও একই রেজাল্ট। এমন নয় যে নিশির ফার্স্ট ডিভিশন পাওয়ার ক্ষমতা ছিল না। সে খুবই বুদ্ধিমতী মেয়ে। কিন্তু ইচ্ছে করেই পড়ার থেকে বেশি নাচকে প্রাধান্য দিয়েছে। বাসার কেউ জানে না এসব কথা। স্কুলে এবং কলেজে থাকতে যেকোনো অনুষ্ঠানেই তাকে এবং মুনিয়াকে নাচের জন্যে ডাকা হতো। রাহাতও তার নাচ খুব পছন্দ করে। নিশির চোখের দিকে তাকিয়েই সে অনেক কিছু বুঝে যায়। নিশি ভাবে, এই পৃথিবীতে কেউ তো কাউকে বোঝে না, কিন্তু যতটুকুই পারুক, রাহাত সেটাই বা পারে কীভাবে?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশি বের হয়ে যাওয়ার পরই অয়ন তোশকের নিচ থেকে লেখার খাতাটা নিয়ে বসে। কলেজে থাকতেই সে বেশ কিছু ছোটগল্প লিখেছে। তার কয়েকটা দৈনিক পত্রিকা আর কিছু বুদবুদের মত খ্যাতিহীন লিটল ম্যাগাজিনে ছাপাও হয়েছে। তবে বাসার কেউ জানে না এ কথা। এটা যেন নিষিদ্ধ কোনো কাজ। এবার ও চোখ কান বন্ধ করে একটা উপন্যাস লিখেছে। লেখার আগেই মাথায় নামটা ঘোরপাক খেয়েছে আনেক দিন ধরে। "ভোর হয়, তবু ভোর হয়।"

লেখা প্রায় শেষের পথে। কিন্তু কিছু কিছু জায়গা নিয়ে সে এখনো পুরোপুরি খুশি হতে পারছে না। হেমিংওয়ের মতোন একই দৃশ্য সাতাশ বার লিখবার ধৈর্য ওর না থাকলেও একটু ঠিক করতে হবে। অয়ন লিখতে শুরু করে–

"কলেজ থেকে রিটায়ারমেন্টের আগে থেকেই হোসেন আলি বাসায় ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ান। যদিও তিনি কুমিল্লা মহিলা কলেজের ইংরেজির শিক্ষক তবু ছেলেরাও তাঁর নাম শুনে দূর থেকে আসে। মেয়েরা আসে বিকেলের দিকে। এখনকার ছেলেমেয়েরা ইংরেজিতে বড় কাঁচা; সহজ একটা বাক্য লিখতে গিয়ে কত যে ভুল করে! মেয়েরা ইংরেজি যত কম জানে তিনি তাতে তত আনন্দ পান। মেয়েদের তিনি খুবই ভালোবাসেন। অত্যন্ত আগ্রহের সাথে মেয়েদের জন্য অপেক্ষা করেন। মফস্বল হলে কী হবে! পোশাক-আশাকের দিক দিয়ে তারা শহরের চাইতে কোনো অংশে পিছিয়ে নেই।

মেয়েরা তাঁর কাছে ফুলের মতন। ওদের প্রতিটি কাজের মধ্যে একটা ছন্দ খুঁজে পান তিনি। কলেজের জানালা দিয়ে তিনি চশমা চোখে গভীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনোযোগ দিয়ে ছাত্রীদের দেখতেন। হাঁটার সময় তাঁদের বুকের একটি নির্দিষ্ট অংশ ওঠানামা করে। "আহা! কী সুন্দর দৃশ্য, পেছনটাও নাচের ভঙ্গিতে দুলে দুলে ওঠে।" ফাইনাল পরীক্ষার আগে যখন ছাত্রীরা সালাম করতে আসে উনি জড়িয়ে ধরে সুরা পড়ে তাঁদের বুকে ফুঁ দিয়ে দেন। অন্যদের কাছে মনে হয় উনি চোখ বন্ধ করে আছেন, আসলে এই ফাঁকে তিনি ওদের আরো কাছ থেকে দেখতে পান। "মেয়েরা আল্লার এক আজিব নিয়ামত।" মনে মনে ভাবেন হোসেন আলি। দোয়া করার সময় ওদের কোমল স্পর্শে তাঁর বুকটা ভরে যায়। কেউ কেউ আবার নিচু হয়ে সালাম করে, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে তখন তাঁর চোখ আরো ধাঁধিয়ে যায়। "আহা, বেহেশতেও এমন আনন্দ আছে কিনা সন্দেহ।" কিছুদিন আগে বৃষ্টিতে ভিজে এক ছাত্রী পড়তে এসেছিল"

এ পর্যন্ত লিখতেই মিতুন তাঁর ঘরে ঢোকে।

"ভাইয়া, লিখছ নাকি? আমাকে একটু পড়তে দেবে?"

"আরে ধুর! নোট লিখছি।" বলে খাতাটা বন্ধ করে অয়ন।

"আমি জানি তুমি গল্প লিখছিলে।" মিতুন বেণি দুলিয়ে বলে।

"তুই দেখছি দিন দিন বেশি পাকা হয়ে যাচ্ছিস পিশি।" নিশির সাথে মিলিয়ে অয়ন মিতুনকে অবলীলায় এখনো ছোটবেলার মতোন পিশি ডাকে।

"তোমাকে না কতবার বলেছি আমাকে পিশি না ডাকতে?" মিতুন ওর বিছানায় বসতে বসতে বলে। অয়ন মিতুনকে দেখে আর ভাবে–"কোন ফাঁকে এত বড় হয়ে গেল মিতুন।" ক্লাস এইটে পড়া মিতুন অয়নের দিকে তাকিয়ে বলে–

"চোখ গোল গোল করে কী ভাবো ভাইয়া?"

অয়নের এখনো মনে পড়ে মাত্র কয়েকদিন আগেও কেমন বোকা বোকা একটা মেয়ে ছিল মিতুন। বাবার দূরসম্পর্কের এক খালা এসেছিলেন কয়েকদিনের জন্য, মিতুনের বয়স তখন নয় কী দশ। ওই মহিলা নিশিকে হাতের কাছে না পেয়ে নয়-দশ বছরের মিতুনকে নামাজের ফজিলত নিয়ে জ্ঞান দেওয়া শুরু করলেন। উনি চলে যাওয়ার পর একদিন অয়ন দেখে মিতুন নামাজ পড়ছে। ইশারায় সে নিশিকে বলেছিল–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এসব কী?" নিশি উত্তর দিয়েছিল–

"নামাজ পড়ছে, তোর কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে বল। জবাব দিবে।"

"তাই নাকি? এই মিতুন এখন কী নামাজ পড়ছিস? আসরের আজান তো দেয়নি এখনো। বেশ দেরি আছে।"

"রাতে আমার অনেক পড়া, কালকে ক্লাস টেস্ট আছে। তাই এখুনি আজকের সব নামাজ শেষ করছি।"

অয়ন মাকে দেখেছে কাজা নামাজ পড়তে। তবে আগেভাগে নামাজ পড়তে দেখা এই প্রথম। ওরা দুই ভাইবোন হাসতে হাসতে মাকে ডাকে।

"মা, দেখো তোমার ছোট মেয়ের কাণ্ড।" নাজমাও ওদের হাসিতে যোগ দেন। মিতুন রাগ করে বলে–

"এই বাসায় ভালো কাজের কোনো দাম নেই। আমি আর নামাজই পড়ব না।" ওর কথায় আরো হাসে নিশি আর অয়ন। তবে মা ওকে জড়িয়ে ধরেন–

"আহা আমার লক্ষ্মী মেয়েটাকে নিয়ে তোরা সব সময় হাসাহাসি করিস।" মিতুন জায়নামাজ হাতে কেঁদে ফেলে।

"তোমরা নিজেরা তো নামাজ পড়োই না আবার আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করো। নামাজ না পড়লে তোমাদের কী দশা হবে জানো?"

বাসায় কেউ বেড়াতে এলেই মিতুনের এই কাহিনী বহুদিন পর্যন্ত শুনিয়েছে ওরা।

অয়ন মানিব্যাগ থেকে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট বের করে মিতুনের হাতে দিয়ে বলে–

"প্লিজ, কাউকে বলবি না।"

"আমাকে ঘুষ দিচ্ছ? আচ্ছা বলব না, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে কিন্তু।"

"বেশি চালাক হয়ে গিয়েছিস তাই না?" বলে মিতুনের কানটা মুচড়ে দেয় অয়ন। গোসল করেই বাইরে যেতে হবে। অয়ন কাপড় হাতে বাথরুমে ঢোকে। নাজমা তাঁর রান্না শেষ করে মিতুনকে ডাকেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এই তোর পরীক্ষা কয়টার সময় রে?"

"দশটা থেকে মা।"

"আয় কিছু একটা মুখে দে। আসতে আসতে তো অনেক বেলা হয়ে যাবে।"

"ভাত খাব না মা। ঘুম পায়।"

"অল্প করে খেলে ঘুম পাবে না, কাছে আয় তো।" তিনি প্লেটে ভাত, ছোট মাছ আর করলা ভাজি মেখে মেয়েকে খাওয়াতে শুরু করেন।

"মা, করলা ভাজি খাব না।"

"আচ্ছা, আর করলা দেব না। ডাল দেব একটু?" মিতুন মাথা নাড়ায়।

খাওয়ানো শেষ করে তিনি শাড়িটা বদলে নেন। "মেয়েটার বয়স মাত্র ১৩ বছর। কিন্তু দেখতে লাগে ষোল-সতেরোর মতো। লম্বাও হয়েছে বেশ। পাঁচ ফিট চার ইঞ্চি। এমন স্নিগ্ধ মায়াকাড়া চেহারা মেয়েটার, সাজলে না জানি কেমন লাগবে।" ভাবেন নাজমা।

নাজমা মিতুনকে গত বছর থেকে স্কুল থেকে আনা-নেওয়া করেন। "এই মেয়েকে একা ছাড়া ঠিক না, চারদিকে আজেবাজে লোক কেমন করে যেন তাকায় মেয়েটার দিকে।" মিতুনও বোঝে কেন মা তাঁর সঙ্গে যায়। বাথরুম থেকে বের হয়ে অয়ন দেখে মা দোয়া পড়ে মিতুনের মাথায় ফুঁ দিচ্ছেন।

"কীরে মিতুন তোর পরীক্ষা-টরীক্ষা নাকি?" অয়ন চুল মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ ভাইয়া।"

"ক্লাস এইটে আবার কী পরীক্ষা?"

"তুমি দেখি কোনো খোঁজখবরই রাখো না। এখন তো ক্লাস ফাইভ থেকেই পরীক্ষা শুরু হয়।" নাজমা মিতুনকে নিয়ে বাসা থেকে বের হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাজমা আর মিতুন বাসা থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে অয়ন দোতলায় নোমান চৌধুরীর ঘরে একটা খাতা নিয়ে উঠে আসে।

"কেমন আছো সোনাদাদু?"

"তোকে না দেখে কি আর আমি ভালো থাকতে পারি? কিন্তু তোর এই অবস্থা কেন?"

"কী অবস্থা দাদু?" অয়ন খাতার মধ্যে থেকে সদ্য পাল্টে লেখা উপন্যাসের অংশটা বের করতে করতে বলে।

"বুঝতে পারছি না ঠিক। কেমন যেন অস্থির-অস্থির, সারাদিন বাইরেই থাকিস নাকি?"

"আরে না না। বইয়ের প্রকাশক খুঁজে বেড়াচ্ছি তো, তাই। বই বের করা যে এত কঠিন হবে, এটা আমি আগে বুঝিনি।"

"প্রথম বইয়ে এরকম একটু আধটু হয়েই থাকে। একবার লোকজন তোর বই পড়া আরম্ভ করলে দেখবি দরজায় প্রকাশক ঠেকাতে লোক রাখতে হবে।" বলতে বলতে শব্দ করে হাসেন নোমান সাহেব। অনিচ্ছা নিয়েও হাসিতে যোগ দেয় অয়ন। পরক্ষণেই গিলে ফেলে হাসিটা।

"দাদু, বইটা শেষমেশ বের করতে পারব তো?"

"অপেক্ষা কর, অত ঘোড়ায় জিন লাগিয়ে সবকিছু হয় নাকি?"

"প্রায় দুমাস তো সবার পেছনে লেগে আছি, আর কত?"

"ক'টাকা লাগে বই ছাপতে? প্রথম বইটা নাহয় আমিই ছেপে দিই?"

"আরে দূর, পরিবারের লোক বই বের করে দেবে, এটা হয় কখনো দাদু? আমি ও ঘরটায় যাচ্ছি একটু, কেমন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ওটা তো তোরই ঘর, পারমিশন লাগবে কেন?" নোমান সাহেবের সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ে।

নোমান সাহেবের মাস্টার বেডরুমের পর একটা ঘর বাদ দিয়ে ছোট একটা স্টাডি-কাম-লিভিং রুম। প্রায় ছোটবেলা থেকেই অয়নের দখলেই বলা চলে। একটা তিন-ফুটি টেবিল আর ছোট একটা চেয়ারের পাশে দু দেয়ালজুড়ে বই ঠাসা র‍্যাক। হঠাৎ দেখলে বইয়ের ভারে পড়ে যাবে বলে মনে হয়।

টেবিলের ডান দিকের একদম নিচের ড্রয়ার থেকে আলগোছে একটা নীল রঙের ফাইল বের করে অয়ন। প্রায় আধা ইঞ্চি পুরু। তার প্রথম পাণ্ডুলিপি। খুব নরমভাবে ফাইলের কাভারে হাত বোলায়। যেন কোনো বাবা তার নবজাতককে প্রথম স্পর্শ করছে। ফাইল খুলে খুব সাবধানে ভেতর থেকে পেজ নাম্বার খুঁজে শেষ বদলানো অংশটা ঢুকিয়ে নেয়।

সযত্নে বুকের কাছে ফাইলটা চেপে ধরে রাস্তায় নেমে আসে অয়ন। এটার আরো ফটোকপি করা লাগবে। এর আগে পনেরোটা কপি করেছিল—একটাও কোনো কাজে লাগেনি। এবার আরো দশটা ফটোকপি করা লাগবে। পরে দরকার হলে ফটোকপি থেকে কপি করবে। এভাবে অরিজিন্যালটা নিয়ে বের হতে তার বুক কাঁপে। মানুষকে ফটোকপি করে জীবনের ধুলোবালিতে পাঠানো গেলে মন্দ হতো না—ভাবে সে। পাণ্ডুলিপিটা আঁকড়ে ধরে হাঁটতে থাকে অয়ন।

তাকে পাশ কাটিয়ে একটা সাদা রঙের পাজেরো কিছুটা সামনে গিয়ে আচমকা ব্রেক করে হর্ন দিয়ে ওঠে। অয়ন তাড়াতাড়ি রাস্তার এক পাশে সরে আসে। গাড়ি থেকে নেমে সানগ্লাস পরা একজন তরুণী ইতস্তত পায়ে তার সামনে এসে দাঁড়ায়।

"অয়ন না?"

লিনিয়াকে দেখে অয়ন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। কয়েক সেকেন্ডের জন্যে ওর হাত-পা মাথার আদেশকে মানতে ভুলে যায়।

পাণ্ডুলিপিটা ওর হাত থেকে মাটিতে খসে পড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাজমা আর মিতুন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার সময় বাসার সামনের ছোট উঠোনের মতন জায়গাটায় আজিজ সাহেব লুঙ্গি উঁচু করে বসে পান খাচ্ছিলেন। মিতুন একবার আড়চোখে বাবাকে দেখলেও নাজমার তেমন ভাবান্তর হলো না। কী যেন একটা বলতে গিয়ে আজিজ সাহেবও চুপ মেরে গেলেন।

মানুষের কাছ থেকে উপরি নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে মাস ছয়েক আগে অস্থায়ীভাবে সাসপেন্ডেড হয়েছেন তিনি। এখন বিভাগীয় মামলা চলছে। মামলার ফলাফলটির ওপরে তাঁর চাকরিটি এখন মাকড়সার সুতোর মতো ঝুলছে।

"লোকটার লজ্জা বলে কি কিছু নেই?" চাকরিতে শেষবার যখন পুরো বেতন নিতে যান লোকে বলাবলি করছিল। এরপরেও সাসপেনশনে থাকাকালীন নিয়মানুসারে প্রাপ্য এক-তৃতীয়াংশ বেতন অবলীলায় পান চিবুতে চিবুতে নিতে গেছেন তিনি।

আজিজ সাহেবকে দেখে এসব বোঝার কোনো উপায় নেই। আগের মতোই ভোরে বাজারে যান এবং সাড়ে দশটার দিকে বাসা থেকে বের হয়ে যান। রমনা পার্কের বেঞ্চে বসে বাদাম আর পান খান। তার বেঞ্চের আশেপাশের পিচ্চিকিচ্চিরা জেনে গেছে যে প্রতিদিন এগারোটা থেকে তিনটা-চারটা পর্যন্ত তিনি এখানে থাকেন। এখানে তার ঘুমটা খুব ভালো হয়।

সেন্টু নামের দশ-এগারো বছরের একটা ছেলে চা বিক্রি করে। তাঁর সঙ্গে আজিজ সাহেবের খুব খাতির হয়ে গেছে। উনি পার্কের বেঞ্চে বসতে এলেই সে ছুটে এসে চা দেয়। সেই চা অমৃতের মতন লাগে তাঁর। উনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুমাবার তোড়জোড় করলেই তাঁর মাথা বানিয়ে দেয় সেন্টু। ঘুম থেকে উঠেই তিনি সেন্টুকে ঠাকুরমার ঝুলির গল্প বলেন। সেন্টু মুগ্ধ হয়ে শোনে। গত দুমাস থেকে বাংলা পড়ানোর চেষ্টা করছেন। তিনি লুকিয়ে মিতুনের পুরোনো বর্ণমালার বই, খাতা, পেন্সিল আর ইরেজার সেন্টুকে এনে দিয়েছেন। ছেলেটার বুদ্ধি ভালো, খুব দ্রুত শিখে যায় সব। পড়ালেখার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ তার।

আজিজ সাহেব তিনটার দিকে প্রায়ই একবার অফিসে যান। পরিচিত মুখগুলো না দেখলে ভালো লাগে না।

"কী জয়নাল সাহেব, কেমন আছেন?" তিনি অফিসের কলিগদের সাথে আলাপ জুড়ে দেন। "দেখলেন তো আমাকে ভালোমানুষ পেয়ে কেমন করে ফাঁসালো! মাথার ওপর আল্লাহ সাক্ষী আমি যে কোনো অপরাধ করি নাই উনি জানেন।"

অফিসের সবাই মোটামুটি তাঁর ব্যাপারে জানে। তারপরও কেন যে এসব বলেন তাঁরা বোঝে না। "এই তো আর মাত্র দুটো মাস, তারপরই ফিরছি আবার।" কিংবা "জামাল সাহেব কেমন অভদ্র দেখলেন? এই অফিসে ২৫ বছর ধরে কাজ করছি, অথচ মেয়ের বিয়েতে আমাকে দাওয়াত দিলেন না। আমার কিছু আসে যায় না, এত ব্যস্ত থাকি, যেতেও পারতাম না। তবু ভদ্রতা বলে একটা জিনিস আছে না?" আজিজ সাহেব তাঁর পান খাওয়া লাল দাঁতে গল্প জুড়ে দেন। কেউ তাঁর কথা শুনছে কিনা সেটা নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা নেই।

বাসায় ফেরেন সাড়ে পাঁচটার দিকে। শার্ট-প্যান্ট বদলে লুঙ্গি পরে আবার বারান্দায় বসে চা খান। মাথার মধ্যে অনেক প্ল্যান ঘোরে, কোনটা রেখে কোনটা করবেন বোঝেন না।

এই বাড়িটা তাঁর দূরসম্পর্কের এক খালাতো ভাইয়ের শালার চাচার। মিতুনের জন্মের পর ভাড়া বাসার মালিক এসে বলল যে তার পরের মাস থেকে এক হাজার টাকা বেশি দিতে হবে। তখনো উপরি টাকার ব্যাপারটা ভালো করে ধরতে পারেননি তিনি। তবে যখন খোঁজ নিয়ে জানলেন তাঁর ওই দূরসম্পর্কের চাচা ধানমন্ডিতে বিশাল এক বাড়ি নিয়ে থাকেন, তখন আর দেরি না করে ঠিকানা বের করে দেখা করেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না।" প্রথম দেখাতেই নোমান চৌধুরী তাঁকে দেখে বলেছিলেন। আজিজ সাহেব নিচু হয়ে সালাম করে বলেছিলেন—"আমারই দোষ মামা। চাকরি করে এতবড় একটা সংসার সামলে কোনোদিন আপনার খোঁজখবর নিতে পারি নাই। আপনার শরীরটা ভালো? মামিজানকে তো দেখছি না। উনি কি বাইরে?"

"না না। বাসাতেই আছেন। মোনা মোনা! এদিকে একটু আসো তো। ও! আপনার তাহলে মোনার সাথে পরিচয় আছে।"

"না না, পরিচয় নাই, তবে আপনাদের দুইজনের এত প্রশংসা শুনেছি সবার কাছে, তাই আসলাম। আপনার বাড়িটা খুব সুন্দর। কত বড় বড় ঘর। আমি তো এরকম একটা ঘরের ভাড়া দিতেই মরে যাচ্ছি। একটা ঘরের মধ্যে কোনো রকমে থাকি।"

এরপর নোমান সাহেবের স্ত্রীকে দেখেই তিনি ইনিয়ে বিনিয়ে নানাভাবে নিজের অভাবের বর্ণনা শুরু করেন। তাঁর বর্ণনা শুনে যেকোনো মূর্তিরও চোখে জল আসবে। নোমান চৌধুরীরা দোতলায় থাকতেন। একতলায় তিনটে গ্যারেজ ছাড়া সবগুলো ফাঁকা ঘর। দু-তিনটাতে দারোয়ান, মালি আর কেয়ারটেকার থাকে। সুমনা চৌধুরী হঠাৎ বলেন—"আহা তোমরা এত কষ্ট করো! আমাদের একতলার চার-পাঁচটা ঘর তো খালিই থাকে, তবে খুব ছোট ছোট। নাহলে তোমাকে বলতাম এখানে এসে থাকতে।"

আজিজ সাহেব তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই আরো একবার দুজনকে সালাম করেন। "আপনারা ফেরেশতা, মানুষ না। আল্লাহ আপনাদের হায়াত দারাজ করুক। আমি যে কী বলে আপনাদের ধন্যবাদ দিব"—বলতে বলতে কেঁদে ফেলেন তিনি।

এই কান্নাটাও তাঁকে অনেক কষ্টে রপ্ত করতে হয়েছে। নোমান চৌধুরী আর সুমনা চৌধুরী দুজনেই একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন।

দুদিনের মাথায় আজিজ সাহেব তাঁর দুই কন্যা, এক পুত্র এবং স্ত্রীকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। লোক লাগিয়ে সামনের চারটা বড় ঘর সঙ্গে ছোট বারান্দা—পুরোটাই পরিষ্কার করে দখল করে নিয়েছিলেন। নিচের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবচেয়ে বড় ঘরটাকে দুভাগে ভাগ করে রান্নাঘর ও খাবার ঘর বানিয়েছিলেন, একটি ঘরে স্ত্রীকে নিয়ে থাকেন, অন্যটিতে এক বিছানায় দুই মেয়ে, আরেকটিতে ছেলে।

নাজমার জোরাজুরিতে অন্যটিকে ড্রইংরুম বানিয়েছেন। প্রথম দিকে ওটা খালিই ছিল। পরে নোমান চৌধুরী নতুন সোফা কিনে তাঁদের পুরোনো সোফাটা আজিজ সাহেবদের দিয়ে দেন। নিশি একটু বড় হতেই রুমটা চমৎকার একটা বসার ঘরে পরিণত হয়েছে। এই রুমে বসলে যেকোনো অচেনা মানুষ তাঁদের মধ্যবিত্ত ভাববে। এখন আজিজ সাহেবের মনে একমাত্র চিন্তা বাসাটা তাঁর ছেলেমেয়েদের নামে লেখানো যায় কিনা। নোমান সাহেবের দুই ছেলেই তো বহু বছর ধরে আমেরিকায় থাকে। তারা কি আর ফিরে আসবে?

নাজমা এই সংসারটাকে আগলে রাখে একাই। আজিজ সাহেব শুধু বড় বড় কথা বলেন। কাজ করতে হয় সব নাজমাকেই। নিশি একটা প্রাইভেট কলেজে অনার্স পড়ছে, তাঁর বিয়ে দিতে হবে। কীভাবে যে কী করবেন বুঝে উঠতে পারেন না। তবে এ বাসায় ওঠার পর থেকে তিনি পাঁচশ টাকার একটা ডিপিএস করেছিলেন ব্যাংকে। দশ বছরে সেখান থেকে দুই লাখের কিছু কম টাকা পেয়েছিলেন। ওটা ওই ব্যাংকেই এফডিআর করে রেখে দিয়েছেন। এ টাকার কথা কেউ জানে না। তাঁর আসল ভরসা ছিল আজিজ সাহেবের চাকরি। কিন্তু চাকরি চলে যাওয়ার পরেও আজিজ সাহেবের কোনো পরিবর্তন নেই। আরেকটা চাকরিও যে খুঁজছেন এমন না। এভাবে কি সংসার চলে?

ইদানীং উনি নানারকম আচার, নিমকি বানিয়ে কাছের একটা দোকানে সাপ্লাই দেন। সেখান থেকে সামান্য কিছু টাকা পান। ছেলেটাও তার টিউশনির বেশির ভাগ টাকাই তাঁকে দেয়। তাই এখনো খাওয়া-পরাটা চলছে।

সুমনা মামি বেঁচে থাকতে নানাভাবে ওদের সাহায্য করতেন। তাঁদের দুই ছেলে তখন বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। মামি তাঁর দুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েকে কী যে আদর করতেন। বাসায় ভালো কিছু রান্না হলেই পাঠিয়ে দিতেন নাজমাকে। প্রথমদিকে নাজমার ভয় লাগত, মামা কী মনে করেন কী মনে করেন ভেবে। কিন্তু মামা ওদের খুব আদর করতেন। তাঁর ছেলেরা বাইরে চলে যাওয়ার পর ওদেরকে আরো কাছে টেনে নেন। প্রায়ই বাচ্চাদের সাথে গাড়ি নিয়ে ঘুরতে বের হতেন। "আহা! এমন মানুষটা কেমন করে চলে গেলেন। আজকে দু রাকাত নফল নামাজ পড়ব মামির জন্যে।" নাজমা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশি তাঁর বন্ধুদের নিয়ে বাসায় ঢুকতেই দেখে বাবা বারান্দার মোড়াতে বসে কাঠি দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করছে। রাগে দুঃখে মরে যেতে ইচ্ছে করে। রাগ সামলে নিশি বলল–

"বাবা এই শীতে তুমি বাইরে কী করো? ভেতরে যাও। নাহলে ঠান্ডা লাগবে।"

"আরে শীত কই? এই ডিসেম্বরেও শীত নামল না, নামবেটা কখন? শীত নামবে, তোর মা পিঠা বানাবে, রোদ পোহাতে পোহাতে সেই পিঠা খাব–তবেই না শীত।" আজিজ সাহেব উঠতে উঠতে বলেন। নিশি ড্রইংরুমে বন্ধুদের বসায়। শাহেদ, রুমা, জলি আর ফারহান।

"মা আমাদের একটু চা দেবে? নাশতা কিছু আছে ঘরে?" নিশি নাজমা বেগমকে জড়িয়ে ধরে। ও জানে মা কোনো একটা ব্যবস্থা করবেনই। ফিরে দেখে ওরা সবাই হাসাহাসি করছে।

"কী নিয়ে এত হাসি দেখি?"

"তোর ছোটবেলার ছবি দেখে, টাকলু মাথায় শাড়ি পরে আবার টিকলি পরা।" আবার হো হো করে হাসি।

"না বলে আমার অ্যালবাম দেখছিস কেন?" নিশি অ্যালবাম কেড়ে দৌড়ে শোবার ঘরে রাখে। এখানে আরো অনেক ছবি আছে, যেগুলো দেখলে ওরা ডিপার্টমেন্টে হটকেকের মতন ছড়িয়ে দেবে। বন্ধুদের ভেতরে জলি এই প্রথম এসেছে।

"তোদের বাসার বাগানটা কী সুন্দর!" জলি বলে।

"এটা আমাদের বাসা না, বাবার এক মামার বাড়ি, আমরা নিচের তলায় ভাড়া থাকি।" নিশি একটু অস্বস্তি নিয়েই মিথ্যে বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এই একটা সিগারেট ধরাই?" শাহেদ একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করে।

"একদম লাঠি দিয়ে তোর হাত ভেঙে দেব, এখানে সিগারেট খাওয়া নিষেধ।" নিশি চোখ রাঙায়।

"কেন? তোর বাবা, আঙ্কেল খান না?"

"এখানে আসার আগে খেত। কিন্তু সোনাদাদুর জন্য ছেড়ে দিয়েছে।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই নাজমা বেগম গরম গরম ভাপা পিঠা নিয়ে ঘরে ঢোকেন।

"ভালো আছ তোমরা? অনেক দিন পরে এলে।"

"আন্টি আমার নাম জলি।"

"তোমার কথা নিশির কাছে অনেক শুনি মা।" নাজমা বেগম জলিকে জড়িয়ে ধরে বলেন—"তোমার মা ক্যান্সারে মারা গেছেন শুনেছি আমি।" জলির চোখের পানিতে নাজমার আঁচল ভিজে যায়। উনি শাড়ি দিয়ে জলির চোখ মুছে দেন।

"বসো মা, বসো।" উনি জলিকে প্লেটে একটা পিঠা তুলে দেন। "নিশি, চা রেডি আছে, পিঠা খাওয়া হলে নিয়ে আসিস।" নাজমা বেগম ঘর থেকে বের হয়ে যান।

জলি ওদের ফার্স্ট গার্ল। এত ঝামেলার মধ্যেও পরীক্ষা দিয়ে সবার উপরে তার নাম উঠে এসেছে। বন্ধুদের নিয়ে নতুন স্যার সম্পর্কে অনেকক্ষণ হাসাহাসি করল নিশি। ওদের বয়সটাই এমন যে হাসার জন্যে কোনো বিষয় লাগে না।

ঘণ্টাখানেক পরেই সবাই চলে গেল। নিশি বেণি খুলে চুল আঁচড়াচ্ছিল, তখনই কলিংবেলটা বেজে উঠল। চিরুনি হাতে দরজা খোলে নিশি। ফারহান দাঁড়ানো।

"আমার মোবাইলটা বোধ হয় ফেলে গিয়েছি।" অজুহাতের ভঙ্গিতে বলে সে। ড্রইংরুমের সোফার এক কোনা থেকে ফোন খুঁজে পায় সে। তারপর বসতে বসতে বলে—

"এক গ্লাস ঠান্ডা পানি খাওয়াতে পারো?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাইকে লুকিয়ে আর একবার দেখা করার জন্যে পানি খাবার অজুহাতটা মন্দ না। মুখ টিপে হাসে নিশি। ওর যে খুব একটা খারাপ লাগে তা অবশ্য নয়। কিন্তু রাহাতের কথা ভেবে ফারহানকে, অথবা অন্য কাউকে, আশকারা দিতে ইচ্ছে করে না তার।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তড়িঘড়ি করে ফাইলটা মাটি থেকে উঠিয়ে নেয় অয়ন। ওঠাতে গিয়ে আর একবার অল্পের জন্যে মাটিতে আবারও পড়তে পড়তে বেঁচে গেল বেচারা ফাইল। লিনিয়া অবাক হয়ে বদলে যাওয়া ছেলেটির কাণ্ডকারখানা দেখছিল।

"কেমন আছো অয়ন?"

"ভালো। তুমি কেমন আছো?" দায়সারা গোছের উত্তর দেয় অয়ন।

"তোমার হাতে এটা কি?"

"আমার প্রজেক্ট থিসিস। ওই ফাইনাল টার্মে যেটা লাগে সেটা আর কি।"

"ও আচ্ছা। তুমি বোধ হয় কোনো কাজে যাচ্ছিলে।"

লিনিয়া গাড়িতে উঠে বসে। অয়ন আবার হাঁটতে শুরু করে।

অনেক বদলে গেছে অয়ন। এক জীবনে তার জন্যে নীরবে পাগলপারা হয়ে থাকা অয়ন এটি নয়। কোনো ঝকঝকে রোদেলা দুপুরের দিঘি এটি নয়। বরং ঝড়ের আগের গুমোট ভারি আকাশের মতো। কেমন অনায়াসে বলে দিল—এটা থিসিস। ওর দিকে ভালোভাবে তাকাতেও যেন অয়নের ইচ্ছে করছিল না। সেই অয়ন—পাশের পাড়ার ইউথ ক্লাবের পিং পং টেবিলে ইচ্ছে করে তার কাছে হেরে যেত যে অয়ন। সোনাদাদুর কাছ থেকে লিনিয়া মাস দুএক আগে থেকেই জানে থিসিস গ্রুপ থেকে নিজের নাম সরিয়ে নিয়েছে অয়ন। ক্লাসও করছে না তেমন একটা। কী করছে, সেটা সোনাদাদুর কাছ থেকে জানতে চায়নি লিনিয়া।

একটা অদ্ভুত দোষী ভাব তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। যদিও লিনিয়া জানে—দিস ওয়াজ নট টু বি। রাস্তার উল্টো পাশের বাড়িতে থাকলেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওদের দুজনের মধ্যে রাস্তা ছাড়াও মাথা উঁচিয়ে আছে অনেক কিছু। একশ গজের মধ্যে থাকলেও একই স্কুলে যায়নি ওরা কখনো। নামী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের লিনিয়া আর প্রায় নামহীন সরকারি স্কুলের অয়ন, পাড়া থেকে বেরুলেই দুজনে ভিনগ্রহের বাসিন্দা। মাঝখানে নিরেট, নির্মম রাস্তা। ও লেভেল শেষ করে লিনিয়া মালয়েশিয়ায় এ লেভেল করতে যাবার পর কেবল রাস্তা নয়, সৌরজগৎটাই পাল্টে যাবার কথা, ভাবে লিনিয়া।

তবু মনটা ভার হতে থাকে ওর–সেই অয়ন–ওর সামনে এলেই মুখটা বোকাটে, কিন্তু চোখটা ধারালো থাকত যার–মিথ্যে বলাটা এখনো আয়ত্ত করতে পারল না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ভাইয়া, এটার দশটা ফটোকপি করে দেবেন?"

"বসেন ভাই। একটু সময় লাগবে। এই হাতের কাজটা শেষ কইরাই আপনারটা ধরব।"

অয়ন দোকানের সামনের ছোট টুলটায় বসে পড়ল। বসবার পর বুঝতে পারল টুলের একটা পা-র নিচের দিকটা খয়ে গিয়ে ছোট হয়ে গেছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ভাঙা একটা ইটের টুকরো এনে কোনো মতে ঠেস দিয়ে সোজা করার চেষ্টা করল।

দোকানের ছেলেটা ওর দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলল—"এহন থিক্যা যার যার টুল নিজেগোই আইনা বসতে অইব মনে অয়।"

অয়নের শরীর তখনো একটু একটু কাঁপছে। এত দিন হয়ে গেল তবু লিনিয়াকে দেখলে সময় যে কখন আলগোছে উল্টো দিকে যেতে থাকে, বুকের মধ্যে কেমন ভূমিকম্পের পরবর্তী দুলুনি হতে থাকে—এর কারণ অয়ন জানে। কিন্তু একপেশে প্রেমের পরিণতিটা সে আরো ভালোভাবে জানে। পাপী লাভ, তাও এক তরফের। লিনিয়া তাকে কখনো প্রশ্রয় দিয়েছে বলে মনে করতে পারে না। অয়নের ঠোঁটে এক চিলতে হাসি জেগে উঠে মিলিয়ে যায়।

তবু নদীকে কেউ থামিয়ে রাখতে পারে? নদী তো সাগরের দিকে যেতেই থাকে। পরিণতির কথা না ভেবেই। সাগর কখনো উজানের দিকে ফেরত আসবে না, সামান্য একটু জোয়ারের ভাণ করা ছাড়া। হয়তো সাগর কোনো এক দিন মেঘ হয়ে উঁকি দিতে আসবে নদীর দিকে। ততদিনে নদীর অস্তিত্বই বোধ হয় আর থাকবে না, আর থাকলেও, তার পথ যাবে বেঁকে।

"আপনার কপিগুলো দেইখা মিলায়া লন।"

ছেলেটার আওয়াজে চোখ ফেরায় অয়ন। টাকা দিতে দিতে হেসে বলে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"থ্যাংক ইউ ভাই। এরপর নিজের টুল না হোক, একটা ইট নিয়ে আসার চেষ্টা অবশ্যই করব।"

বাড়ি ফিরে মূল পাণ্ডুলিপিটা তুলে রাখে অয়ন। ফটোকপিগুলো বড় বাদামি খামে ঢুকিয়ে রাখে। এগুলো নিয়ে আবারও বাংলাবাজারের পথে পথে হাঁটতে হবে ভেবে কুঁকড়ে যায় মনে মনে।

তাছাড়া দেশের কয়েকজন বড় গল্পকার আর ঔপন্যাসিকের কাছে পড়তে দেওয়া হয়েছে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা। তাদেরও একটু খোঁজ নেয়া দরকার।

অয়নকে অনেকটা উদভ্রান্তের মতো চলে যেতে দেখে এক পা এক পা করে কোনার স্টাডি রুমে এসে দাঁড়ান সোনাদাদু। কী মনে করে টেবিলের ডান কোনার ড্রয়ারটি ঠিকমতো লাগানো আছে কিনা দেখতে গিয়ে প্লাস্টিক ফাইলে ঢোকানো পাণ্ডুলিপিটার দিকে চোখ পড়ে তাঁর। অয়ন আগেই পড়তে দিয়েছিল তাঁকে।

যতবার পড়েন তাঁর ততবারই নতুন বলে মনে হয়। পাতা ওল্টাতে গিয়ে চোখ আটকে যায় এক জায়গায়:

"হোসেন আলি মাঘ মাসের তীব্র শীতেও দরদর করে ঘামছেন। তার মাথা নিচু, লজ্জায় আর অপমানে তিনি তাকাতে পারছেন না। তার হাতে একটি ছোট স্যুটকেস। হাতের কাছে যা পেয়েছেন স্যুটকেসে নিয়ে এসেছেন, ক্যাশ টাকা আর ব্যাংকের চেকবই খুব সাবধানে প্যান্টের ভেতরে আলাদা একটা লুকানো পকেটে রেখেছেন। তার দৃষ্টি কিছুটা বিভ্রান্ত, কোথায় যাবেন বুঝতে পারছেন না।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটি লোকাল ট্রেনে উঠে পড়েন। তার গোপন দুর্বলতার কথা এখন মানুষের মুখে মুখে। তিনি অকৃতদার। এতদিন সবাই জানত তিনি শিক্ষার জন্যে বিয়ে করেননি। তার শারীরিক ত্রুটির কথা কখনো কাউকে বলতে হয়নি। এবার বলতে হলো এবং একজনের কাছে নয়, কোর্টের ঘরভর্তি মানুষের সামনে। এই লজ্জা তিনি কোথায় রাখবেন, কোথায়ইবা যাবেন তিনি এই বয়সে...।"

পাণ্ডুলিপিটা সযত্নে বন্ধ করে প্লাস্টিক ফোল্ডারে তুলে রাখেন সোনাদাদু। কভারে ক্যালিগ্রাফির ধাঁচে লেখা উপন্যাসের নামটা জ্বলজ্বল করতে থাকে: "ভোর হয়, তবু ভোর হয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিতুন নোমান চৌধুরী, মানে তার সোনাদাদুর কাছে বসে বাংলা খবরের কাগজ পড়ে শোনায়। এটা তাঁর প্রতিদিনের নিয়ম। সব খবর সে পড়ে না। মৃত্যুর খবরে সোনাদাদু খুব অস্থির হয়ে পড়েন। তাই ওই ধরনের খবর সাধারণত এড়িয়ে যায়।

"আচ্ছা গত সপ্তাহে একটা ছেলে মারা গিয়েছিল না? যারা মেরেছে তারা কি ধরা পড়েছে?" নোমান চৌধুরী একটু উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করেন। মিতুন ভুলে গত সপ্তাহের এই মৃত্যুসংবাদটার এক লাইন পড়েছিল। পরে পুরোটাই পড়তে বাধ্য হয়েছে। তারপর থেকে রোজই নোমান চৌধুরী একই প্রশ্ন করেন।

"হ্যাঁ দাদুভাই, ওদেরকে ধরেছে তো। আমি পড়িনি কালকে?" মিতুন ইচ্ছে করেই মিথ্যে বলে।

"ও তাহলে মনে হয় ভুলে গিয়েছি। ইদানীং অনেক কিছুই ভুলে যাই আমি। তোর পরীক্ষা শেষ হয়েছে?

"হয়েছে।"

"তুই তো ইংরেজিটা শিখলি না ভালো করে মিতুন।"

"থাক। আমার আর ইংরেজি শেখার দরকার নেই। ভাইয়াকে চোখের সামনে দেখছি না সারাক্ষণ পড়াশোনা আর লেখালেখি নিয়ে থাকে।"

"তাতে অসুবিধাটা কী হয়েছে।"

"ভাইয়ার জীবনটা ঠিক আমাদের মতন নয়। তবু আমার মনে হয় মনে মনে অনেক কষ্টে আছে ভাইয়া। দাদু তুমি কি একটু উঠে বসবে? সারা দিন তো কেমন শুয়েই থাকো।" মিতুন তাঁকে বসতে সাহায্য করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ওই ছবিটা একটু এনে দিবি মিতুন?" মিতুন সোনাদাদু আর দিদার একটা ছবি টেবিল থেকে এনে দেয় নোমান সাহেবের হাতে। এই ছবিটা সে অনেকবার দেখেছে। মনে হয় বিয়ের একদম পরপর তোলা। "তোর দিদা কী সুন্দর ছিল দেখেছিস?"

"আমি বুঝি দিদামণিকে দেখিনি?" পাল্টা প্রশ্ন করে মিতুন।

"আমার যে আর সময় কাটে না। কবে যাব ওর কাছে?" নোমান চৌধুরী মিতুনকে জড়িয়ে ধরে বাচ্চাদের মতন কাঁদেন। ওড়না দিয়ে চোখ মুছিয়ে দেয় মিতুন আর বলে–

"বসো তো ঠিক করে। রোজ রোজ এরকম কান্না করলে আমি কিন্তু আর আসব না।" বাচ্চাদের মতন বকুনি দেয় মিতুন। দিদামণি আর সোনাদাদু–এদের মতো মানুষ আর হয় না। দিদামণির কথা ভাবলে তার নিজের চোখই ভিজে ওঠে। সোনাদাদুকে আর কী বলবে সে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অয়ন দুইটা টিউশনি করে, দুটোই গুলশানে। এখন সে পড়াতে এসেছে জারাকে। অঙ্কে একটু কাঁচা মেয়েটি। ক্লাস এইটে পড়ে। নামী একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। মেয়েটা লক্ষ্মী। মন দিয়ে পড়া বোঝার চেষ্টা করে। পড়ার বাইরে কথা খুব কম বলে। আজকে জিন্সের প্যান্টের সাথে লাল একটা ফতুয়া টাইপের কাপড় পরেছে।

জারা অঙ্ক করে আর অয়ন মনে মনে জারার সাথে মিতুনের তুলনা করে। মিতুন যদি এরকম একটি পরিবারে জন্ম নিত তাহলে কেমন হতো? সারাক্ষণ কামিজ ওড়না পরে জড়োসড়ো হয়ে থাকতে হতো না। ভালো স্কুল, ভালো খাবার, ভালো একটি পরিবেশ ওকেও বদলে দিত। মিতুন জারার থেকে কম সুন্দর না, পড়ালেখাতেও বেশ ভালো। অয়ন একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের ভেতর আটকে রাখে।

এমনকি জারার মাকে দেখেও বোঝা যায় না যে তাঁর এত বড় বড় দুজন ছেলেমেয়ে আছে। উনি একটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ান। উনিও প্যান্টের সাথে ফতুয়া পরে জিমে যান। ভদ্রমহিলা দেখতে সুন্দর, গায়ের রংটা তেমন ফর্সা নয়। তবে সব মিলিয়ে খুব ভালো লাগে। শরীরের কোথাও কোনো মেদের চিহ্ন নেই। সপ্তাহে তিনদিন অয়ন এখানে আসে। তখন কখনোসখনো দেখা যায় রুমানা শরীফকে। সপ্তাহে একদিন সাতটার দিকে অয়ন আসে এখানে। তখন রুমানা শরীফকে শাড়িতে দেখা যায়। অয়ন হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। কী যে সুন্দর লাগে! অন্যরা না জানি কী করে। তাঁর গয়নাগুলো সোনার হলেও কেমন যেন চকচকে নয়।

রুমানা অয়নের দিকে কড়া নজর রাখেন। যে দুদিন ও সাড়ে তিনটার দিকে আসে, ওর জন্য স্যান্ডউইচ, ঘরে বানানো কেক আর কফি অথবা পাস্তা, হালুয়া আর কফি থাকে। ওই দুদিন অয়ন দুপুরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু খায় না। জারাকে পড়াতে আসা মানেই সুস্বাদু সব খাবার খাওয়া। প্রথমদিকে অয়নের লজ্জা লাগত, শুধু কফিটা খেত। একদিন রুমানা শরীফ এসে বললেন–

"এই ছেলে, তুমি তো দেখি কফি ছাড়া কিছু খাও না, ব্যাপারটা কী বলো তো?"

অয়ন উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল–

"না, আমার তেমন খিদে থাকে না। তাই..."

"আমি জানি তুমি ক্লাস থেকে সোজা এখানে আসো। তুমিই বলেছিলে একদম প্রথমে। খবরদার! আর যদি কোনো খাবার ফেরত যায় তোমার থেকে তাহলে জারাকে আর পড়াতে হবে না।" মিষ্টি ধমকের সুরে বলেছিলেন রুমানা শরীফ। এখন আর লজ্জা করে না, যা দেয় সবটাই খেয়ে ফেলে। একবার বন্ধুদের সাথে একটা বড় ক্যাফেতে গিয়েছিল অয়ন। এ বাড়ির কফিটা ঠিক ওরকম।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, তোশকের তলা থেকে লেখার খাতাটা বের করে অয়ন। মাথায় কদিন ধরে আরেকটা গল্পের প্লট বেড়ে উঠছে। ভুলে যাবার আগে লিখে ফেলা দরকার। যদিও প্রথম উপন্যাসের ভাগ্যে কী আছে এটা সব সময় তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, তবু কাগজে কলমটা সে নামিয়ে আনে:

"বাসায় ফিরেই শিরিন রফিকের মায়ের সাথে চিৎকার শুরু করেন। তোমাকে কি আমি মাছ রাঁধতে বলেছিলাম, কেন রাঁধলে? আমি শুধু ফুলকপি আর মটরশুঁটি বেছে রাখতে বলেছিলাম। তোমার ভাই এত দাম দিয়ে কই মাছগুলো এনেছিল। বলেছিল শীতের সবজি দিয়ে আর টমেটো দিয়ে একটু পাতলা ঝোলে রাঁধতে।"

"আমি মনে করছিলাম...

"তুমি কী মনে করে আলু দিয়ে মাছ রাঁধলে? বলো, বলতেই হবে আজকে।"

রফিকের মা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। সে একটু কাজ কমাতে চেয়েছিল খালাম্মার। সে জানে এখন কোনো কথা বললেই উনি আরো রেগে যাবেন এবং চড়-থাপ্পড়ও দিতে পারেন। "এই মাইয়া মানুষটা সারাক্ষণ ক্যাটক্যাট করে। কুনুদিনও মুখ দিয়া একবার কইলও না—তোমার কাজ ভালা অইছে। জন্মের পর মুখে কি মধু দেয় নাই?" রফিকের মা মনে মনে বলতে থাকে। "অথচ এক্ষণ যদি একটা ফোন আসে, তাইলে কী হাসিমুখে কথা কইব। চোখের তারা তুই-এ মানাইতো ভালো"—ভারতীয় সিরিয়াল-এর কথা মনে করে মুচকি হাসি লুকায় রফিকের মা। সারাদিন কি হাপিত্যেশ করেই না সে বসে থাকত সিরিয়ালটার জন্যে।

আবার ফোঁস করে ওঠার আগেই ফারিয়া রান্নাঘরে ঢুকে মায়ের হাত ধরে টেনে মাকে বের করে নিয়ে আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মা দিনদিন তোমার মেজাজ এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে! এরপর থেকে তোমার চিৎকার রেকর্ড করে রাখব। শুনলে তুমি বুঝবে আজকাল কেমন করে খালার সাথে কথা বলো। আর তোমার তো প্রেশারও বেড়ে যায়। তাছাড়া খালা চলে গেলে আরেকজনকে খুঁজে পাবে?" মেয়ের কথায় একটু শান্ত হন শিরিন।

"কেন, তুই নিজে রান্না করলেই পারিস, তাহলে আর কোনো খালা-টালা লাগবে না, বেশি দরদ!"

"আচ্ছা মা, কাল থেকে আর কলেজে যাব না, বাসার সব কাজ করব, খুশি তো?" ফারিয়া হাসতে হাসতে বলে।

"তারপর হাত-পা পুড়িয়ে বিয়ে বন্ধ করবি, তাই তো?"

"এই ছেলে ছাড়া কি আর কোনো ছেলে দেশে নেই যে আমাকে বিয়ে করবে? আমি কি এতই বিশ্রী দেখতে?"

শিরিন তার ছোট মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে ভাবেন, "ইশ! গায়ের রংটা যদি আরেকটু ফর্সা হতো!" শিরিন একটা কিন্ডারগার্টেনে পড়াতেন। বছর দুয়েক হলো চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। শামসুল সাহেব ততদিনে উপরি টাকা নেওয়া শুরু করেছেন। কাজেই টাকার দরকার তেমন নাই। অবশ্য এমনিতেও শেষের দিকে স্কুলে আর ভালো লাগত না তাঁর। নতুন নতুন অল্পবয়সী বেশ কিছু মেয়ে জয়েন করেছিল। তাঁদের অশ্লীল কথাবার্তার জন্যে টিচার্স রুমে বসা যেত না। একজনের নতুন বিয়ে হয়েছিল, তাঁকে যে সবাই কত রকম আজেবাজে প্রশ্ন করেছিল। উফ্, পারেও ওরা। ভাগ্যিস এখন আর স্কুলে যেতে হয় না।

শামসুল হক সাহেব এখনো ডেপুটি সেক্রেটারি। তাঁর সঙ্গে যারা চাকরিতে ঢুকেছিলেন তাঁদের বেশির ভাগই এখন সেক্রেটারি এবং ঢাকা শহরে তাঁদের বাড়ি-গাড়ি আছে। কেউ কেউ ছেলেমেয়ে আত্মীয়স্বজনের নাম ভাঙিয়ে বিদেশেও বাড়িঘর তৈরি করে ফেলেছে। যদিও কেউ এসব কথা পারতপক্ষে স্বীকার করে না। নানা রকমের চেতনার নাম ভাঙিয়ে মাটিতে গদগদ হয়ে শুয়ে পড়াটা রপ্ত করে নিয়েছে অনেকেই। শামসুল হকের পদোন্নতি না হলেও অসৎ আর ধামাধরাদের তরতর উন্নতি হয়েছে। মাঝখানে দীর্ঘদিন সৎভাবে থাকায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি অনেকের শত্রু হয়েছেন। সংসারের কথা, নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবেই তিনি বহু বছর এসব থেকে দূরে থেকেছেন।

কিন্তু এখন তিনি বুঝে গিয়েছেন যে অসৎ হওয়া ছাড়া সরকারি বেতনে ভালোভাবে বাঁচার কোনো উপায় নেই। বরঞ্চ নিজে একটু উপরির ওপরে নির্ভর করে উচ্চমধ্যবিত্তের জীবনে প্রবেশ করেছেন তিনি। তবু তাঁর মাঝেমধ্যেই মনে হয় স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেই কি মনের ময়লা সব ধুয়ে যায়? যে আদর্শের কথা ভেবে বিদেশ পাড়ি না দিয়ে সরকারি চাকরিতে ঢুকেছিলেন সেটা কি এতটাই ভুল ছিল?"

...অয়ন খাতাটা বন্ধ করে ফেলে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রহমত মিয়ার ভেতরে একটা দ্বৈত সত্তা আছে। কখনো কখনো নোমান চৌধুরীকে তাঁর খুবই ভালো লাগে, ফেরেশতার মতন। আবার কখনো তাঁর ঐশ্বর্য দেখে মাথায় রক্ত উঠে যায়। কেন তাঁর জন্ম এরকম একটি পরিবারে হলো না? আল্লাহর এটা কেমন বিচার? কেউ না খেয়ে থাকবে আর কেউ টাকার ওপরে শুয়ে থাকবে? তখন তার মনে চায় নোমান চৌধুরীকে খুন করে ফেলতে।

"খালুজান, ঘুমাইন?"

"না, কিছু বলবে?"

"হ! আমাদের গেরামেরই একটা সত্য ঘটনা। পেপারে উঠছিল। টিলিভিশনেও দেখাইছে।"

"তাই নাকি? কী ঘটনা?"

"একটা গরুর প্যাট থেইকা এক বাচ্চা মানুষের লাহান হইছিল।"

"কী বল এইসব?"

"সত্য কইতাছি। আমিও গেছিলাম দ্যাখতে। আমাগোর পাশের গেরামে।"

"নাম কী গ্রামের?"

"ফেরির চর। আল্লাগো আল্লা, সামনের আধাটা মানুষের বাচ্চার লাহান। মুখ থাইকা লইয়া বুক পর্যন্ত বেবাকটাই মানুষ। খালি পিছনের অর্ধেক বাছুর।"

"এটা কখনো হয় নাকি?"

"আমি কইতাছি না খালুজান নিজের চোক্কে দেখছি? আপনে পিপারে ফুটু দেখেন নাই?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না, আমি এসব আজগুবি খবর পড়ি না।"

"তাহলে মিতুন মাইরে জিগায়েন।"

"আচ্ছা, জিজ্ঞেস করব।" নোমান চৌধুরী মাঝে মাঝেই ভুল করে রহমত মিয়ার এই ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেন। একবার সে গল্প শুরু করলে সেটা শেষ যে কখন হবে তা কেউ জানে না।

"আরেকবার আমাগোর গেরামে এক মাইয়ার বিয়া দিছিল আরেক গেরামে। হের পর সোয়ামি গেছে বাজারে।"

"এটা কি অন্য একটা গল্প?"

"গল্প না খালুজান। আমাগোর চোক্কের সামনে ঘটছে।"

"আচ্ছা বলো।" নোমান চৌধুরী একটু অসহায় বোধ করেন।

"সইন্ধ্যা হইছে, ছেড়ি শোনে কে জানি দরজায় ধাক্কা দিতাছে। সোয়ামি মনে কইরা দরজা খুলছে। আর লগে লগেই হের পিডে দিছে এক থাপ্পর আর গলায় হাত দিয়া চাইপ্পা ধরছে। ছেড়ি তো তহনই মাটিতে পইড়া গেছে। এহন কন দেখি, হের সোয়ামির কোন দোষ আছিল?"

"তাহলে কে মারল মেয়েটাকে?"

"উই যে, উনারা।"

"উনারা আবার কে?"

"বুঝলেন না", রহমত ফিসফিস করে বলে, "চোক্কে তো দেহা যায় না।"

"ও! ভূত?"

"না না, পৈরাল।"

"সেটা আবার কী?"

"জিন-পরী খালুজান।"

"জিন-পরীদের হাত আছে নাকি?"

"হ, আছে না আবার? পিডের উপর আর গলায় বড়বড় পাঁচ আঙুলের ছাপ।"

"তারপর কী হলো?"

"পুলিশ তাঁর সোয়ামিরে ধইরা নিয়া গেল। হের কিন্তু কুনু দোষ নাই।"

নোমান চৌধুরী বলেন–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তোমার গল্প তো দেখি প্রায় সুপারন্যাচারাল থ্রিলারের মতো।"

"হেইডা আবার কিতা?"

"রহমত মিয়া, তুমি যে কীসব আজগুবি গল্প বলো। আমার গল্প শুনবে?" নোমান চৌধুরী হাসেন।

"আপনের গল্প তো সব খালাম্মারে নিয়া। শুনতে শুনতে আমার কান পইচা গেছে।" নোমান চৌধুরী একট দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। রহমত মিয়া ঠিক কথাই বলেছে। তাঁর সব গল্পের সাথেই কোনো না কোনো অংশে মোনা থাকে। সন্ধ্যায় হাসনাহেনার গন্ধের মতো। দেখা যায় না, তবু আছে।

"কী করব বলো তো রহমত। যার সঙ্গে জীবনের ত্রিশটা বছর কাটিয়েছি তাকে ছাড়া কি কোনো গল্প হতে পারে। তোমার বিয়ের কত বছর হলো রহমত মিয়া?" রহমত মাথা নিচু করে। সে আস্তে আস্তে বলে–

"আড়াই বছরের মতন।"

"ঠিক বুঝলাম না।"

"আমাগো বিয়ার আড়াই বছরের মাথায় আমার বউ জরিনা সুন্দরী চেয়ারম্যানের পোলার লগে ভাইগা গেছিল।"

"আর ফিরে আসে নাই?"

"না। তহন আমার পোলা মতির বয়স ছিল দেড় বৎসর। এইসব কথা থাউক এহন খালুজান।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অয়নের বাংলাবাজার পৌঁছাতে দুপুর গড়িয়ে গেল। বাস, টেম্পো, পায়ে হেঁটে বাংলাবাজারে আসাটা তেমন সহজ নয়—এ কমাসেই সে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। অনেক প্রকাশকেরই একটা আলাদা অফিস ঠিকানা আছে শহরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, কিন্তু সত্যিকারের ঠিকানা যেহেতু এখনো পুরোনো ঢাকা, সেহেতু প্রকাশকরা সাধারণত দিনে একবার হলেও এখানটায় ঢুঁ মারেন।

ঘিঞ্জি গলির পর গলি, সরু একতলা-দোতলা এমনকি চারতলা পর্যন্ত পুরোনো সুড়কির বাড়ি। কোনো কোনো অংশ নতুন হলেও মলিনতাই হচ্ছে মূল পরিচিতি। সব দালানেই সারি সারি কামরা—তিন থেকে চার সারির কম নেই কোথাও। এমনকি প্রধান রাস্তাতেও ফুটপাথ ভর্তি কাগজের স্তূপ। থাকে থাকে সাজানো হরেক রঙের কাগজ। সাদাই বেশি চোখে পড়ে। কোনো কোনো কাগজের থাক কালির ভারে জর্জরিত, কোনো কোনো কাগজের থাক কালির অপেক্ষায় উন্মুখ।

প্যাকেট ভরা পাণ্ডুলিপি নিয়ে একজন প্রকাশকের মুখোমুখি হয় অয়ন। অবশ্য শুরুতেই দুজন বলেছেন তাঁরা বড়দের বই ছাপেন না। নোটবই আর বাচ্চাদের বই ছাপেন। ভদ্রলোক মাঝবয়েসী, ভারি চশমার ফাঁকে তাচ্ছিল্যের স্বরে জানতে চাইলেন গল্পটা কী নিয়ে। দুতিন মিনিট শোনার পরেই বললেন—

"এ সমস্ত আর চলে না ভাই। অন্য কিছু ল্যাখেন। প্রেমের উপন্যাস ল্যাখেন পারলে। রগরগা প্রেমের উপন্যাস। তাইলে চেষ্টা কইরা দ্যাখা যায়।"

রগরগা প্রেমের উপন্যাস কী জিনিস সেটা অয়ন ঠাউরে উঠতে পারে না। জিজ্ঞেস করারও সাহস হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অথবা ভূগোলের নোটবই। সবচাইতে ভালো হয় বিসিএস-এর জেনারেল নলেজের বই।"

দ্বিতীয়জন দোতলার এক কোনে চায়ের স্টলে এক টুলে বসে আরেক টুলে পা রেখে আয়েস করে চা খাচ্ছিলেন। বেশ একটা মেকি মমতা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন এর আগে অয়ন কার কার কাছে গিয়েছিল। নামগুলো শুনে প্রত্যেকের কোনো না কোনো খুঁত ধরে বকাবকি করলেন এক প্রস্থ। তারপর অয়নকেও উপদেশ দিলেন অনেকক্ষণ–

"আপনারা তো নতুন, এখনো রাস্তাঘাট ঠিকমতো চিনেন নাই। বড় কবি লেখকদের আড্ডায় যাবেন, তাদেরকে মদ-টদ খাওয়াবেন। দরকার হলে ঢাকা ক্লাব, গুলশান ক্লাবে গিয়ে মাজারে মানত দেয়ার মতো তাঁদের যা-তা কথা শুনবেন। মদ খেয়ে টাল হয়ে গেলে তাদেরকে বাসায় পৌঁছাইয়া দিবেন। পরের দিন আবার গিয়া মদ খাওয়াইবেন। উনারা বললে তবেই না আপনি লেখক। আর এদের মধ্যে কেউ যদি সম্পাদক টম্পাদক হন, তাইলে তো কথাই নাই। দলে ভিড়া যাবেন। এক নামে সবাই আপনারে চিনবে। আর তাঁদেরকে বলবেন, গত এক শ বছরে তাঁর মতো সম্পাদক হয় নাই। উনি যেইটা মাইনা নিবে সেইটাই ল্যাখা–বাকিগুলো তেলাপোকার ল্যাদা। বুঝলেন কিছু? আপনার কি চলে? মদ না ইনজেকশন?"

আমতা আমতা করে অয়ন মাথা নাড়ে–"জি, কোনোটাই না।"

"তাহলে আর কী করে হবে। আচ্ছা একটা কপি ওই কামরাটার টেবিলে রেখে যান। মাসখানেক পরে খবর নিয়েন। ফোন করলে নাও ধরতে পারি, নিজে আসাটা ভালো।"

অয়ন আবারো রাস্তায় নামে। একটা বুড়ো ভ্যানওয়ালার দিকে চোখ পড়ে তার। অন্তত সত্তর বছর বয়স হবে, পরনে ছেঁড়া খোঁড়া শার্ট-লুঙ্গি, খালি পা। করুণ চোখে ভ্যানের পাশে দাঁড়িয়ে সামনের বইয়ের দোকানের অ্যাসিস্ট্যান্টের কথা শুনছিল। রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট তাকে বুঝিয়ে যাচ্ছে–

"আপনারে তো কইছি চাচা, আমাদের বান্ধা ভ্যানগাড়ি আছে। ওরে ছাড়া বই আমরা কাউরে দেই না। তাছাড়া অন্য বইগুলো তো বাইন্ডারের কাছে। এখনো শুকায় নাই। কাইলকা হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বাবা, সকাল থেইকা বইসা আছি, কোনো খ্যাপ পাই নাই। আমি খুব বেশি দোকানদারেরে চিনি না। ভ্যান রাইখা, দোতলাতও যাইতে পারতাছি না। চালান হয় নাই বাবা। একটা ব্যবস্থা কইরা দাও।"

এত বৃদ্ধ ভ্যানচালক এর আগে দেখেছে বলে অয়ন মনে করতে পারে না। সে ভাবে, নিজের বোঝা আর বইয়ের বোঝা নিয়ে এ লোক চলতে পারবে? পকেট থেকে বিশ টাকা বের করে সে এগিয়ে যায়–

"চাচা, আমি ভ্যান পাহারা দিচ্ছি। আপনি কিছু খেয়ে নেন।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুলি ঘরে ঢুকে বলে—

"ভাইজান খাইবেন না। বেলা তো অনেক হইয়া গেছে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই খাব। কয়টা বাজে এখন?" অনিচ্ছা সত্ত্বেও নড়েচড়ে ওঠেন নোমান সাহেব।

রহমত ঘরের দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে—

"তিনটা বাইজা তিরিশ মিনিট।"

"ভাইজান খাবার এইখানে দিয়া যামু?"

"দিয়ে যাও, এখানেই দিয়ে যাও।" রহমত মিয়া উঠে ফুলির পেছনে পেছনে রান্নাঘরের দিকে যায়।

"ফুলি বুজান, আমার কাছে খাওন দিয়া দেন।"

"ও-ও, সবার সামনে ফুলি বুজান। আর যহন আমারে দরকার পড়ে তহন ফুলি ফুলি কইরা কূল পাও না।"

ফুলি এই বাসায় পঁচিশ বছরের মতন আছে। আরো কাজের লোক থাকলেও ফুলিকেই তাদের সরদার বলা চলে। সে যা বলবে তাই হবে। বয়সে সে রহমতের চেয়ে সাত-আট বছরের বড় হবে। ফুলি রহমতকে মাঝেমধ্যেই তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছে। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখগুলো কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে ওঠে রহমতের। তারপর থেকেই ফুলির বদ্ধমূল চিন্তা হয়ে গেছে যে রহমত তাকে আরো কাছে চায়। রহমতের চোখে যে তখন পারুল ভাসতে থাকে এ কথা তার জানা নেই।

তার বিবেচনায় কেউ তার দিকে তাকিয়ে থাকার একটাই মানে হতে পারে। কেউ তার দিকে তাকিয়ে আছে ভাবতেই তার নিজেকে আরো শক্তিশালী বলে মনে হয়। তবু ফুলি তাকে বিশ্বাস করতে পারে না। ওর ধারণা সে পৃথিবীর সব পুরুষ মানুষদের চিনে ফেলেছে। সাগর দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে, নোনা জলের কথা কারো মনে থাকে না।

সন্ধ্যার দিকে অয়ন পরপর দুজন ছাত্রীকে পড়ায়। দ্বিতীয়জনের নাম রাইসা। মেয়েটি ভদ্র ও বুদ্ধিমতী। তবে তাঁর মা খুবই বিরক্তিকর। প্রথম থেকেই কথা হয়েছিল যে অয়ন তাঁকে এক ঘণ্টা পড়াবে। কিন্তু রাইসার মা দ্বিতীয় দিন থেকেই বললেন–

"অয়ন, রাইসার কিন্তু এক ঘণ্টায় পড়া হয় না। ওকে দেড় ঘণ্টা পড়াতে হবে।" রাইসা বারবার বলার চেষ্টা করে যে এক ঘণ্টাই তার জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু ফারজানা খান বলেই যাচ্ছিলেন–

"দেখো না বাবা দেড় ঘণ্টা পড়াতে পারো নাকি? অনেকদিন কোনো টিচার ছিল না তো, তাই মেয়েটা আমার পিছিয়ে পড়েছে সবার থেকে।"

রাইসার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিল। সে মোটেও কারো থেকে পিছিয়ে নেই। মায়ের এই স্বভাবের জন্যে প্রায়ই তাঁকে বিব্রত হতে হয়। অয়ন অবশ্য মিসেস ফারজানা খানের কথায় রাজি হয়ে গিয়েছিল।

"নিশ্চয়ই, আমি ওকে দেড় ঘণ্টাই পড়াব। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না।" অথচ সেও জেনে গেছে যে রাইসা তাড়াতাড়ি সব বুঝে ফেলে। শুধু তাঁর মায়ের বিরক্তিকর অনুরোধের কাছে হার মানতে হয়েছিল। অয়ন যদি চার-পাঁচ মিনিট আগে যাওয়ার চেষ্টা করে উনি কোথা থেকে যেন উদয় হয়ে যেতেন–

"এখনই যাচ্ছ? দেড় ঘণ্টা তো হয়নি।" রাইসা বলে–

"মা, আমার পড়া শেষ।"

"তুমি একটু মাহিমকে দেখিয়ে দাও না। অঙ্কে ও খুব কাঁচা।" বলেই তিনি মাহিমকে ডাকেন–"মাহিম মাহিম, বই-খাতা নিয়ে এদিকে এসো তো।"

অয়নকে আবার বসতে হয়। প্রথম কিছুদিন রাইসার সাথে তিনিও বসে থাকতেন হাতে একটা বড় ম্যাগাজিন নিয়ে। পাহারা দিতেন মেয়েকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অয়নের খুব খারাপ লাগত। কিন্তু টাকাগুলোর প্রয়োজন ভেবে চুপ থেকেছে। এ বসায় ঢোকার ত্রিশ মিনিটের মধ্যে ঠান্ডা এক কাপ চা এবং প্লেটে কিছু এনার্জি বিস্কিট থাকে। প্রথমদিন অয়ন চা মুখে দেবার পরপর আর কখনো এ বাড়ির চা খায়নি। চায়ের ওপর সব সময় কয়েকটা মরা পিঁপড়া ভাসতে থাকে। চা না বলে ওটাকে পিঁপড়ার স্যুপ বলা উচিত।

রাইসাকে যখন পড়ায় তখন প্রায়ই ভেতর থেকে ফারজানা খানের উচ্চ কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

"সেদিনই এত টাকার সবজি আনলাম, আজকে কীভাবে সব শেষ হলো?"

"খালাম্মা আপনে গত সপ্তাহে আনছিলেন, এর মধ্যে দাওয়াত খাওয়াইলেন, কেমনে থাকব?"

"আবার মুখে মুখে তর্ক করছ! তুমি চুরি করে সব খাও, আমি কি জানি না? আমি কি গাধা যে কিছু বুঝব না?"

"আইচ্ছা তাইলে আমারে বিদাই দেন। আমি মিছা কথা কই নাই।"

"ইশ, তোমার ইচ্ছামতন চলে যাবে? আমি যখন আরেকজন বুয়া পাব তখন যাবে। যতসব চোরের গুষ্ঠি আমার বাসায়। গত মাসে আমার ব্যাগ থেকে টাকা চুরি গেছে। সেটা নিল কে?"

"কসম কাইটা কইতাছি আমি কোনো টাকাপয়সা নিই নাই।"

"থাক আর কসম কাটতে হবে না। চোরের মার বড় গলা। আমাকে ভালো করে এক কাপ চা দাও। আবার চিনি দিয়ে শরবত বানাবে না।"

এগুলো খুব ভদ্র কথা। মাঝেমাঝে উনি অশ্লীল কথাও বলেন। অয়নের ইচ্ছা হয় টিউশনিটা ছেড়ে দিতে। কিন্তু আরেকটা টিউশনি খুঁজতে হবে ভেবে ওসব চিন্তা বাদ দেয়। তাছাড়া মেয়েটির তো কোনো দোষ নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিনিয়া ছোট খালার বাসা থেকে ফেরার পথে অয়নকে দেখেছিল। সেটা কয়েক ঘণ্টা আগের কথা। কিন্তু মন থেকে ওকে ঝেড়ে ফেলতে পারছিল না। আগেও যে খুব একটা পারত তা নয়। এমনকি বিশ নদী উনিশ ঘাটের মাঝিও যেমন তার নিজ গাঁয়ের হিজলতলাকে মন থেকে কখনো মুছে ফেলতে পারে না, হাজার শহরের পর্যটকও যেমন তার নিজ পাহাড়ের গা ঘেঁষা কাঠের আস্তানাকে চোখ থেকে সরাতে পারে না—অনেকটা সে রকম।

দুপুর গড়ালে আনমনে পুরোনো ছবির অ্যালবাম হাতে তুলে নেয় সে। ওর তের বছরের জন্মদিন পর্যন্ত অয়ন আর নিশির ছবি আছে। ছোটভাই রেশাদ অয়ন আর লিনিয়া— তিনজনের একসাথে খেলার ছবিও আছে। কে তুলেছিল এগুলো? নিশ্চয়ই মা। অ্যালবামটা পাশে রেখে ঘুমিয়ে যায় লিনিয়া।

অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যায় লিনিয়ার। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ও অয়নের সঙ্গে ঝগড়া করছে—ছেলেবেলার মতো। আশেপাশে জমে যাওয়া লোকজনের পরোয়া না করে অয়নের হাতের ফাইলটা কেড়ে নিতে চাইছে সে। অয়নের হাতে খামচি দিয়ে রক্তাক্ত করে ফেলছে আর বলছে—"ছোটলোক, মিথ্যুক, এটাতে নিশ্চয়ই তোমার বিলে ড্যু আছে। বিলে ড্যু মানে বোঝ?' আর অয়ন নিজেকে বাঁচাতে বাঁচাতে বলছে, 'বুঝি, বুঝি, ফরাসি একটু আধটু আমিও বুঝি...কিন্তু সব প্রেমপত্র তো কাগজে লেখা থাকে না।"

বাথরুম থেকে ভালোভাবে মুখ ধুয়ে আসার পরও লিনিয়ার গালের গোলাপি রঙের ছোপ পুরোটা মিলিয়ে যায় না। আইফোন টিপে প্লে লিস্ট চালু করে লিনিয়া। ব্লুটুথ বেয়ে বুমবক্সে শেষ শোনা গান গড়িয়ে যায়—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার আকাশ দেখা ঘুড়ি, কিছু মিথ্যে বাহাদুরি,
আমার চোখ বেঁধে দাও আলো, দাও শান্ত শীতল পাটি,
আমার ভিনদেশী তারা, একা রাতেরই আকাশে..."

একটা পড়ার বই নিয়ে জোর করে টেবিলে বসে সে। কুয়ালালামপুরে ফিরতে হবে মাস দুয়েক পরেই। তার দিন পনেরো পরেই পরীক্ষা। তার পরই গ্র্যাজুয়েশন। ওয়াও! কিন্তু তারপর কী করবে সে কিছুই ঠিক করতে পারেনি। মাস্টার্সে ভর্তি হবে? বাবার ইচ্ছে মতো আমেরিকান কোনো ইউনিভার্সিটিতে?

মালয়েশিয়ায় লিনিয়ার তেমন কোনো বন্ধুত্ব হয়নি কারো সাথে। পরিচয় আছে অনেকের সাথে, তবে কেউ কাছের হয়ে ওঠেনি। এক এক জন এক এক দেশের। ভূমিপুত্র, চায়নিজ আর ভারতীয়রা সবাই যেন ভিন্ন পৃথিবীর। রুমমেট আর ডরমিটরির সবার সাথে পার্টিতে গেলেও ওগুলো তার মনে দাগ কাটেনি খুব একটা। ওখানে বেশির ভাগ মেয়েরই ছেলেবন্ধু থাকলেও ওর কাছের কোনো বন্ধু বা বান্ধবী নেই। দেশের বন্ধুদের সঙ্গেও আগের মতো যোগাযোগ নেই—অনেকেই আমেরিকা-ইংল্যান্ডে পড়তে চলে গেছে বা দেশেই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। কুয়ালালামপুরে যাবার প্রথম দিকটার উত্তেজনা ছাপিয়ে কুয়াশার মতো এক একাকিত্ব ঘিরে আছে তাকে।

প্লে-লিস্ট বদল করে লিনিয়া। ডুয়া লিপার 'নিউ রুলস'-এর রিদম সারা ঘরজুড়ে ঝমঝম করে ওঠে—

'বাট মাই লাভ, হি ডাজন্ট লাভ মি, সো আই টেল মাইসেলফ
আই গট নিউ রুলস, আই কাউন্ট এম
ডোন্ট লেট হিম ইন, ইউ'ল হ্যাভ টু কিক হিম আউট এগেন
ডোন্ট বি হিজ ফ্রেন্ড,
ইউ নো ইউ আর গন্না ওয়েক আপ ইন হিজ বেড ইন দি মর্নিং..."

দরজা গলিয়ে মুখ বের করে মা হাসিমুখে উঁচু স্বরে জিজ্ঞেস করেন—
"ঘুম ভাঙল, প্রিন্সেস?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়ের আদর্শ ছেলেই বলা চলে অয়নকে। মা যা বলেন তাই করে। কিন্তু এবার আর সে তা পারেনি। ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছে না। তার বদলে উপন্যাসের প্রকাশক খুঁজে বেড়াচ্ছে।

নতুন লেখকের বই কেউ ছাপাতে চায় না। এদেশের এক বড় ঔপন্যাসিকের কাছে তাঁর নিজের উপন্যাসের একটা ফটোকপি দিয়ে এসেছিল। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রফেসর ডক্টর মনসুর চৌধুরী। তাঁর লেখা একবার পড়া শুরু করলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত পড়তেই হয়। চুম্বকের মতন আটকে যায় চোখদুটো বইয়ের পাতায়। আজকে উনি যেতে বলেছেন তাঁর ডিপার্টমেন্টে। তাঁর মতামত জানাবেন, লিখে দেবেন অয়নের বই সম্পর্কে কিছু একটা, সেটা সে বইয়ের ফ্ল্যাপে ছাপাতে পারবে। একটু টেনশন হচ্ছে অয়নের।

গত মাসে লেখক রফিউদ্দীন খানের কাছেও তাঁর উপন্যাসটি পড়তে দিয়েছিল। এক সপ্তাহ পরেই অয়নকে তিনি চিনতেও পারলেন না। এবং বইটির ফটোকপিও হারিয়ে ফেলেছিলেন। অয়নকে বলেছিলেন আরেকটা কপি দিতে। অয়ন তাঁর কাছে আর যায়নি।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি গ্রন্থাগার পেরুতে পেরুতে বছর কয়েক আগের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল তার। সময় পেলেই মাঝেমধ্যে হাবিব মিয়ার দোকানে চা খেতে আসত সে। অবশ্য একই সাথে নতুন-পুরোনো লেখক-কবিদের কথাবার্তা শোনাটাও একটা বাড়তি আকর্ষণ ছিল তার। কয়েকজনের সঙ্গে চেনাজানাও হয়ে উঠছিল ধীরে ধীরে। এই সুবাদেই পরিচয় হয়েছিল 'আপ্লুত নিরব শিকদার'-এর সাথে। ওর থেকে বছর কয়েকের বড়। লিটল ম্যাগাজিনগুলোকে নাকি কাঁপিয়ে রাখে এই উঠতি প্রজন্মের কবি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অয়ন গল্প লেখে শুনেই ঢুলু ঢুলু কিন্তু ট্যারচা চোখে তাকে পরখ করার ভঙ্গিতে প্রশ্ন করেছিল, "কামুর 'দি আউটসাইডার' পড়া হয়েছে?" অয়ন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে একটু চিন্তা করে বলেছিল, "জি, আমি কামুর 'দি স্ট্রেঞ্জার' পড়েছি, একটা সেকেন্ড হ্যান্ড বইয়ের দোকান থেকে কিনেছিলাম।" চা-এর দাম দিয়ে উঠতে উঠতে নেংটি ইঁদুরের দিকে লোকে যেভাবে তাকায় সেভাবে তার দিকে তাকিয়ে 'আপ্লুত নিরব শিকদার' সরবে বলেছিল, "এগুলো পড়া না থাকলে লোকের এদিকটাতে আসার সাহস হয় কীভাবে? অবশ্য লেগে থাকো, তোমার হয়তো হবে না, তবু চেষ্টা করো।"

এর বেশ কয়েক মাস পরে অয়ন টের পেয়েছিল 'দি স্ট্রেঞ্জার' আর 'দি আউটসাইডার' একই বই। আমেরিকায় 'দি স্ট্রেঞ্জার' হিসেবে ছাপা হওয়া বইটি ইউরোপে ছাপা হয়েছিল 'দি আউটসাইডার' নামে। এ কথা তার জানা ছিল না।

ডক্টর মনসুর চৌধুরীর রুমের কাছে যেতেই দেখল বড় একটা তালা ঝুলে আছে। একজন পিয়ন টাইপের লোক বলল "স্যার তো বাসায় চলে গেছেন।" অয়নের মুখটা অন্ধকার হয়ে গেল। লোকটি বলল—"উনি একটা খাম রেখে গেছেন। বলেছেন অয়ন নামের কেউ আসলে তাঁকে দিতে।"

"আমার নাম অয়ন। ভাই খামটা আমাকে দেবেন?" লোকটা তাঁর পকেট থেকে একটা সাদা খাম বের করে দিল। খামটা কুঁচকে আছে।

"থ্যাঙ্ক ইউ ভাই।" অয়ন খামটা নিয়ে লোকটিকে বিশ টাকার একটি নোট দেয়। খামটা নিয়ে সে পকেটে রাখে। এখনই খুলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। নিচে নেমে অপরাজেয় বাংলার পাশে মাঝারি এক বটগাছের নিচে বসে সে। চারদিকে একটু দেখে নেয় কেউ তার দিকে তাকিয়ে আছে কি না। খাম খুলে পড়তে গিয়ে চোখ ভিজে যায় অয়নের। খামের ভেতরে দুটো কাগজ। একটা মনসুর চৌধুরীর অফিসিয়াল প্যাডে লেখা। অয়ন প্রায় এক ডজন বার উল্টেপাল্টে পড়ে লেখাটি, ভাবে জাদুর কালির মতো উবে যাবে না তো লেখাটা?

"নতুন লেখককে পরিচয় করিয়ে দেয়ার মতন আনন্দের আর কিছু নেই। আমার মনে হয় বাংলা সাহিত্যে নতুন এক কণ্ঠস্বরের উদ্ভব হয়েছে। ইমতিয়াজ রহমানের লেখা এক নিঃশ্বাসে পড়ার মতন। লেখার পরতে পরতে রয়েছে নিবিড় পাঠ আর অনুশীলনের ছোঁয়া। বয়সের বিবেচনায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে পড়লে পাঠকেরা তার প্রতি অবিচার করবেন। অভিজ্ঞতা সময়ের পথ ধরে আসলেও, অনুভব আর দৃষ্টি সব সময় অভিজ্ঞতার নিয়ম মেনে চলে না।..." আরো অনেক কিছু।

আরেকটি কাগজে লেখা—"সুপ্রিয় অয়ন, তুমি আমার লেখাটি নিয়ে বইয়ের একদম ওপরে অন্য একটি কাগজে বেল্টের মতন রাখতে পারো। আমি ভুল কিছু লিখিনি। তোমাকে অভিনন্দন। তুমি নীলাদ্রি পাবলিকেশন্সের কাছে চলে যাবে। আমার চিঠি দেখলে ওরাই তোমাকে গাইড করবে বলে আমি আশা করি। ভালো থেকো।"

চোখ মুছে অয়ন খুব তাড়াহুড়া করে ফটোকপির দোকানে গিয়ে ডক্টর মনসুর চৌধুরীর লেখাটি পনেরোটা ফটোকপি করল। কেন যে এতগুলো ফটোকপি করল সে নিজেও জানে না। এরপর সে সিএনজি নিয়ে সোজা বাংলাবাজারে পৌঁছাল। প্রথমেই মনসুর চৌধুরীর লিখে দেওয়া নীলাদ্রি পাবলিকেশন্স খুঁজে বের করল। নীলাদ্রির মালিক ওসমান আলি অয়নকে দেখেই বলল—

"বসুন বসুন। আপনিই সম্ভবত অয়ন, তাই না?"

"জি, আমার একটা..."

"জানি জানি, স্যার ফোন করেছিলেন। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। পাণ্ডুলিপি আর স্যারের লেখাটা দিন। আমি বইয়ের কাভারের ওপরে অনেক ওপর স্যারের লেখাটা ছেপে দেব। তাছাড়া ফ্ল্যাপেও লেখাটা থাকতে পারে।"

আজকে ঘুম থেকে উঠে যে অয়ন কার মুখ দেখেছিল! এই বাংলাবাজারের ভাঙাচোরা রাস্তাও যেন কৃষ্ণচূড়ায় ঢেকে যাচ্ছে, যেন সব কোলাহল হইচই ছাপিয়ে জাকির হোসেনের তবলার বোল শুনতে পাচ্ছে সে।

পাণ্ডুলিপি নিয়ে ওসমান সাহেব বললেন—"আপনার মোবাইল নাম্বার আর ঠিকানাটা একটু লিখে দিয়ে যান। প্রুফ দেখতে হবে তো তাই।" নীলাদ্রি থেকে বের হয়ে চোখ ঝাপসা হয়ে যায় অয়নের। কল্পনার কৃষ্ণচূড়ার পাপড়িগুলোকে বুকপকেটে ভরে নিতে ইচ্ছে করে তার।

প্রথম খুঁজে পাওয়া মিষ্টির দোকান থেকে সে এক কেজি ছানার সন্দেশ কিনল বাসার জন্যে। সোনাদাদুর জন্যে কী কিনবে ভেবে পেল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোতলার পর্চে দুভাই-বোন—লিনিয়া আর রেশাদ-এর সঙ্গে নাশতা করার জন্যে বসেন শোয়েব মাসুদ আর ইসমত মাসুদ। "সমুসাটা খেতে দারুণ হয়েছে মা"—বলে লিনিয়া। "দেশের সব খাবারই তোমার কাছে এখন অমৃতের মতো লাগবে। আগে তো এগুলো দেখলেই প্যাঁচার মতো মুখ করে থাকতে।" কাপে চা ঢালতে ঢালতে হাসেন ইসমত মাসুদ।

"মা, সোনাদাদু এখন কেমন আছেন?"

"এখন আগের চেয়ে অনেক ভালো আছেন বলে শুনেছি"—মায়ের হয়ে উত্তর দেন শোয়েব মাসুদ নিজেই। "তোমার প্ল্যান কী মামণি? গ্র্যাজুয়েশনের পর কোন দিকে পাড়ি দেবে?"

"এখনো ভাবছি বাবা। হয়তো আমেরিকা থেকেই মাস্টার্স করব। ডোন্ট ওরি, জিআরই দিয়ে রেখেছি। স্কোরও নেহাত খারাপ না।" হেসে উত্তর দেয় লিনিয়া। টপ ফাইভ পার্সেন্টাইল যে দস্তুর মতো ভালো এটা সে খুব ভালো করেই জানে।

"বিয়ে-টিয়ে করবি নাকি?" চোখে দুষ্টুমি নিয়ে শোয়েব সাহেব লিনিয়ার দিকে তাকান। "নো প্রেশার। জাস্ট আস্কিং।" লিনিয়া চোখ নামিয়ে মনোযোগ দিয়ে টেবিল ক্লথের কারুকাজ দেখতে থাকে।

এবার মা ইসমত মাসুদ দুষ্টুমিতে ঢুকে পড়েন—"কাউকে ভালো লেগে গেল নাকি এর মধ্যে? চায়নিজ, মালয়েশিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান, অ্যান্টার্কটিকান? বাংলা বলতে পারা চাই কিন্তু, আর হাত দিয়ে কই মাছের কাঁটা বাছতে পারতে হবে।"

"মাস্টার্সের আগে ওসব ভাবতে চাই না মাম। পিএইচডিতেও ঢুকতে পারি। তাছাড়া সামবডি হ্যাজ টু ইমপ্রেস মি ফার্স্ট।"

নূরী বুয়া পর্চে এসে রেশাদকে বলে, "ভাইয়া আপনার বন্ধু আইসে।" "আসছি আপুনি" কোনোমতে চিকেন রোল শেষ করে রেশাদ দৌড় দেয়।

এই সুযোগে প্রায় ফিসফিস করে লিনিয়া মাকে প্রায় এক নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করে—"আচ্ছা সোনাদাদুদের বাড়ির অয়ন কি আজকাল ড্রাগ ট্রাগ কিছু খায় নাকি? আজকে রাস্তায় দেখলাম। চেহারায় কেমন একটা আলুঝালু ভাব। মিথ্যে কথাও বলে। হাতে একটা ফাইল ছিল। বলল ওটা ওর থিসিস। অথচ আমি শুনেছি ইদানীং ও ক্লাসও করে না ঠিকমতো।"

বাবা-মা একজন আর একজনের দিকে তাকিয়ে একটু গম্ভীর হয়ে যান। নীরবতা ভেঙে শোয়েব সাহেবই উত্তর দেয়—"না, ড্রাগ নেয় না। তবে ওর পড়াশোনার কথা তেমন একটা জানি না।"

"তাহলে ওর ড্রাগ না নেয়ার কথা কী করে জানলে?" লিনিয়া কৌতূহল চেপে রাখতে পারে না।

শোয়েব সাহেব স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে প্রায় অপরাধীর মতো বললেন—"রেশাদকে যখন গত বছর একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করাই প্রায় প্রথম থেকেই ও ড্রাগিস্টদের দলে ভিড়ে যায়। অয়নের বন্ধুরা দেখতে পেয়ে অয়নকে জানায়। অয়ন প্রায় জোর করেই ওকে ওদের খপ্পর থেকে বাঁচিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসে। রেশাদের অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। ওকে রিহ্যাবে পাঠানো ছাড়া উপায় ছিল না। সে সময় সর্বক্ষণ অয়ন রেশাদের খোঁজখবর নিয়েছে। এখন অবশ্য রেশাদ অনেক ভালো। প্রায় পুরোটাই রিকভার করে গেছে। কিছু ভালো বন্ধুও পেয়েছে।"

"এটা কতদিন আগের কথা? আমাকে তোমরা কিছু বলোনি কেন?" লিনিয়া অস্থির হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।

"তুমি নিজে দেশের বাইরে একা পড়তে গিয়েছ। এগুলো শুনলে তুমি পড়ায় মন দিতে পারতে না। দেশে চলে আসতে।" বললেন শোয়েব মাসুদ। "তোমার মাম অবশ্য দেড় বছর আগেই বলতে চেয়েছিল। আমি মানা করেছিলাম।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা বললেন–

"হঠাৎ মিষ্টি কেনরে খোকন, কোনো পরীক্ষায় খুব ভালো করেছিস নাকি?"

"না মা, এমনি আনলাম। তুমি আর বাবা ছানার সন্দেশ পছন্দ করো, তাই। টিউশনি শেষ করে হাঁটছিলাম হঠাৎ মিষ্টির দোকানটা চোখে পড়ল।"

গোসল করতে করতে অয়ন ভাবছিল এখন কি তার ক্লাস শুরু করা উচিত? কিন্তু এতদিন যে ক্লাস করেনি সেগুলোর নোট কে দেবে তাকে? কোনোমতে দুপুরের ভাত খেয়েই দোতলায় সোনাদাদুর কাছে উঠে আসে অয়ন।

"সোনাদাদু, আমার উপন্যাস ছাপা হবে। পাবলিশার পেয়ে গেছি।" বহু কষ্টে উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে রাখে অয়ন।

"সারাদিনের সবচেয়ে ভালো খবরটা দিলি দাদুভাই।" মুখভরা হাসি নিয়ে প্রায় লাফ মেরে সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন নোমান সাহেব।

"তোমাকে কী দেয়া যায় বলো তো?"

"আমার কিছু লাগবে না রে বোকা। কাছে আয়। কতদিন পরে তোকে দেখছি।" নোমান চৌধুরী অয়নকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

"আমি বুঝি আসি না?"

"নাহ, আগের মতন না। কোথায় কোথায় থাকিস তুই বল তো? গায়ের রং কেমন পুড়ে গেছে। আর এখনো তো বই ছাপা হয়নি। ছাপা হবে, বই বিক্রি হবে, প্রকাশক তোকে টাকা দেবে। সে টাকা থেকে আমাকে একটা জিনিস কিনে দিবি, ঠিক আছে?" নোমান চৌধুরী অয়নের সাথে প্রায় এক ঘণ্টা গল্প করেন। অয়ন চলে যাওয়ার পর তাঁর মনে হলো ছেলেটা কেমন যেন পাগলাটে হয়ে গেছে। নিজের অজান্তেই ভুরু কোঁচকালেন তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকদিন পর আরামে ঘুমাল অয়ন। ঘুম ভেঙেই দেখল নিশি রুম থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কলেজে যাবে।

"নিশি, তোকে বেশ সুন্দর লাগছে তো।" নিশিকে পুরোপুরি না দেখেই বলে অয়ন। নিশি ঘুরে দাঁড়ায়।

"সুন্দর মেয়েদের তো সুন্দরই লাগবে। তুই কেন ক্লাস করা বন্ধ করেছিস?"

"আমি কিছুদিন যাইনি। এখন থেকে রেগুলার যাব।" অয়ন আত্মরক্ষার আশ্রয় নেয়, নিশি যে তাকে এ ধরনের কিছু বলতে পারে সেটা তার মাথাতেই আসেনি। নিশি দরজা প্রায় বন্ধ করে অয়নের বিছানার কাছে আসে।

"ভাইয়া তুই কিন্তু মিথ্যে কথা ঠিক করে বলতে পারিস না। কী হয়েছে, কেন লেখাপড়া বাদ দিয়েছিস? তোকে নিয়ে মার কত স্বপ্ন! আর ছয়-সাত মাসের মধ্যে পাস করে তুই চাকরি করবি, আমরা ভাড়া বাসায় উঠব। কারো আশ্রিতা হয়ে আর থাকতে হবে না। মার এসব স্বপ্নের কথা তো তুই জানিস, জানিস না?" অয়ন হঠাৎ রেগে যায়।

"তোকে এসব কথা কে বলেছে? ওই কালো করে লম্বা ছেলেটা যার সাথে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াস?"

"আমি কার সাথে ঘুরে বেড়াই সেটা নিয়ে কথা হচ্ছে না। আমি কখনোই মার মনে কোনো স্বপ্নের আশা বুনিনি। তুই ছোটবেলা থেকে মায়ের আদর্শ ছেলে।" নিশির কণ্ঠস্বর চড়ে যায়। "বল, কেন তুই ক্লাস করছিস না?"

"আমার ইচ্ছা, তোর তাতে কী এসে যায়?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার কিছুই এসে যায় না, কিন্তু মার জন্যে এটা অনেক কিছু। তুই কি জানিস না?" মিতুন ঘরের সাথে লাগোয়া বাথরুমে গোসল করছিল। সে বের হয়ে হতভম্ব হয়ে যায়।

"আমার যা ইচ্ছা আমি করব। সংসারের সব দায়িত্ব কি শুধু আমার? টিউশনি করে টাকা কে দেয় মাকে?" ছোট বাসায় কেউ একটু জোরে কথা বললেই সব ঘরে তা পৌঁছে যায়। নাজমা বেগম দরজা খুলে ভেতরে ঢোকেন।

"কী হয়েছে রে? এত চিৎকার-চেঁচামচি কী নিয়ে?"

"সেটা তোমার আদরের ছেলেকে জিজ্ঞেস করো।" নিশি মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে।

"তেমন কিছু হয়নি মা, তুমি ঘরে যাও।" অয়ন মায়ের দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়।

"তুই পাঁচ মাস ধরে বুয়েটে ক্লাস করছিস না এটা কিছুনা?" নিশি প্রায় চিৎকার করে বলে। নাজমা বেগম কিছু বোঝেন না কী বলছে ওরা।

"অয়ন তুই ক্লাস করছিস না, এটা কি সত্যি?" অয়ন মাথা নিচু করে বসে থাকে। তার উত্তর মিতুন দেয়।

"মা ভাইয়া বড় লেখক হতে চায়। যা সুন্দর ওর লেখা, তুমি পড়বে? তোশকের নিচে আছে লেখাগুলো।" নাজমা বেগম মেঝেতে বসে চিৎকার করে কাঁদতে থাকেন।

"আমার কী হবে আল্লাহ! এখন আমি কী করব?" তাঁর হাত-পা অবশ হয়ে আসে। "নিশি আর মিতুনের কথা কি ঠিক অয়ন?" অয়নের মাথা আরো নিচু হয়ে যায়। সে কোনো কথা বলতে পারে না। "কেন তুই আমাকে দিনের পর দিন মিথ্যে বলেছিস, মিথ্যে স্বপ্ন দেখিয়েছিস? বল, তোকে বলতেই হবে।"

"মা, আমি আজকে থেকে ক্লাসে যাব। তোমার সব স্বপ্নই আমি পূরণ করব।"

"তোর কথা আমি আর বিশ্বাস করি না।" কাঁদতে কাঁদতে বলেন নাজমা বেগম।

"মা, ভাইয়া অনেক বড় লেখক হবে। সমস্ত দেশে ওর নাম ছড়িয়ে যাবে।" মিতুন ওর মার মাথায় হাত রাখে। নাজমা বেগম এক ঝটকায় তাঁর হাত সরিয়ে দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"লেখকদের দশা আমি জানি না? দিনের পর দিন না খেয়ে থাকে, টাকা-পয়সার অভাবে সংসারও করতে পারে না, আমি কি গাধা যে কিছুই জানিনা?" এ পর্যন্ত বলে তিনি আবার হাউমাউ করে কাঁদতে থাকেন। "এর চেয়ে তোর বাবাই ভালো। কাজও করে না মিথ্যেও বলে না। কই তোর গল্প উপন্যাস কই? আমার আশা যখন গেছে তোর লেখার ভূতও তেমনি মাথা থেকে নামাব।" বলেই নাজমা বেগম অয়নের বিছানার পায়ের দিকের তোশক উঠিয়ে একগাদা কাগজ বের করে আনেন, কেউ তাঁকে বাধা দেবার আগেই পাগলের মতন সেগুলো ছিঁড়তে থাকেন। "তোর লেখক হওয়া দেখাচ্ছি আমি।" মিতুন মাকে বাধা দিতে গিয়ে চড় খেয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে। চড়টা খুবই জোরে ছিল, সমস্ত মুখ ব্যথা করছে। কিন্তু তার দুচোখ থেকে যে জল ঝরছে তা ভাইয়ার জন্য। সে ভাইয়ার অনেক লেখাই লুকিয়ে পড়েছে—এত চমৎকার লেখা!

অয়ন কেমন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তাঁর সব লেখারই ফটোকপি আছে সোনাদাদুর বাসায়। এখন মনে হচ্ছে ওগুলো ফটোকপি করে রাখা ঠিক হয়নি। "মা ছিঁড়ে ফেলুক তার সব লেখা। সে একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। লেখক হবার আশা সে কেন করেছিল? এসব তো তার জন্য চিন্তা করাও পাপ। তার লেখাপড়া শেষ করে সংসারের হাল ধরতে হবে, ভালো চাকরি করতে হবে। কেন সে লিখতে শুরু করেছিল?" মনে মনে ভাবে অয়ন। মা আরো কিছুক্ষণ কান্নাকাটি চিৎকার করে বের হয়ে যান।

নিশি একটু অপরাধবোধে ভোগে। কিন্তু বেশিক্ষণের জন্যে নয়। সে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। সবাই একসময় জেনেই যেত ব্যাপারটি। নিশি মা এবং অয়ন—সবার ভালোর জন্যেই এই কথাটা তুলেছিল। নাশতার আশা না করেই বেরিয়ে পড়ে নিশি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুপুরে আজিজ সাহেব রান্নাঘরে ঢুকে ভাত, ডাল, ডিমের তরকারি আর আলুভর্তা করেন। রান্না করতে করতে তাঁর প্রথম সংসারের কথা মনে পড়ে। অয়ন হবার আগে আগে নাজমা রান্নাঘরে ঢুকতে পারত না, বমি আসত। তখন আজিজ সাহেবই রান্না করতেন। রায়েরবাজারে দুই কামরা নিয়ে একটি বাসায় থাকতেন তাঁরা। তখন নাজমা আর তাঁর ভেতরে একটা মধুর সম্পর্ক ছিল। পুরোনো দিনের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তিনি। বাসায় কেউ নেই। ছেলেটাও কেমন এলোমেলো চুলে বেরিয়ে গেল। আজিজ সাহেব শোবার ঘরে ঢোকেন, কাঁদতে কাঁদতে নাজমা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর দুগালে অশ্রুর দাগ এখনো রয়ে গেছে।

"নাজু, নাজু, ওঠো তো। তোমার শরীর খারাপ করবে। কিছু একটা মুখে দাও।" তিনি আলতো করে নাজমা বেগমের হাতে হাত রাখেন। নাজমা বেগম প্রথমে হকচকিয়ে উঠে বসেন। তরপর আবার তাঁর বিলাপ শুরু করেন। আজিজ সাহেব কোমল কণ্ঠে বলেন—"আর কেঁদো না নাজু। ছেলেটা কিছু মুখে না দিয়েই কেমন পাগল পাগল হয়ে চলে গেল। বেচারাকে আর কিছু বলো না। আমি ডিম রান্না করেছি, চলো খাবে একটু।" নাজমা বেগম দীর্ঘদিন পর স্বামীর সাথে ভালো করে কথা বলেন।

"আমি কিছু মুখে দিতে পারব না গো। আমি কী পাপ করেছিলাম, বলো তো? এটা কী ধরনের শাস্তি?"

আজিজ সাহেব বলেন—

"আমার একটা ভালো খবর আছে গো। আমাকে চাকরি থেকে সাসপেন্ড করেছিল ছয় মাসের জন্য। আমি তখন বুঝতে পারিনি। কাল থেকে আবার অফিসে যাব। এবার আর কারো টাকা নিয়ে নয়ছয় করব না। তুমি খুশি হয়েছ নাজু?" নাজমা বেগম আবার কান্না শুরু করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কিন্তু আমি এখন কী করব বলো তো?" আজিজ সাহেব পঁচিশ বছর আগের মতন প্লেটে করে ভাত নিয়ে আসেন শোবার ঘরে। "তুমি নিজে খাবে নাকি আমি খাইয়ে দেব?" নাজমা বেগম কোনো উত্তর দেন না। আজিজ সাহেব ভাত মেখে নাজমা বেগমের মুখের কাছে তুলে ধরেন। ছোট্ট মেয়ের মতন নাজমা বেগম স্বামীর হাতে ভাত খান।

"তুমি খেয়েছ?" নিজের খাওয়া শেষ হলে জিজ্ঞেস করেন নাজমা বেগম। "এই তো এখন খাব।" আজিজ সাহেব নাজমা বেগমের হাতে পানির গ্লাস দিয়ে বলেন।

রান্নাঘরে ঢুকে তিনি একই থালায় একটু খেয়ে নেন। "ইশ! জীবনটা যদি আবার প্রথম থেকে শুরু করতে পারতাম।" মনে মনে ভাবেন আজিজ সাহেব। কোথায় যেন টাইম মেশিনের কথা পড়েছিলেন—ওরকম একটা কিছু।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অয়ন দীর্ঘদিন পর বুয়েটে যায়। সামিরকে দেখে ক্লাসের রুটিনটা টুকে ফেলে। সামির অবাক হয়ে বলে–

"তুই কোথায় ছিলি এতদিন, ক্লাস করিসনি কেন? ফোনও তো বন্ধ ছিল, কেন?" অয়ন মৃদু হাসার চেষ্টা করে।

"আমার বাসায় একটা ঝামেলা চলছিল রে।"

"সেটাও তো ফোন করে আমাদের কাউকে জানাতে পারতি। আমরা কেউ তোর বাসাও চিনি না। সবাই তোকে নিয়ে টেনশনে ছিলাম।"

"নটার এটা কী ক্লাস?" অয়ন প্রশ্ন এড়িয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে।

"এ আই, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট, খুব সোজা। চল ক্লাসে যাই।" সামির আর অয়নকে ঘাঁটায় না। ও যখন নিজ থেকে কিছু বলছে না তখন ব্যাপারটা নিশ্চয়ই খুব সেনসেটিভ।

এ আই নিয়ে গত বছর একটা বই পড়েছিল অয়ন। কিন্তু ক্লাসে গিয়ে তার মনে হয় জীবনে প্রথম বুয়েটে ক্লাস করছে। বুয়েটের প্রথম ক্লাসটা মোটেই ওর কাছে নতুন কিছু মনে হয়নি। কারণ আগে থেকেই একটু প্রিপারেশন নেওয়া ছিল। কিন্তু আজকে স্যার যা পড়াচ্ছেন তার সবটাই ওর মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়।

ক্লাস শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে জামান স্যার অয়নকে কাছে ডেকে বলেন–"একটার দিকে আমার সাথে দেখা করবে।" অয়ন মাথা নাড়িয়ে বলে–"জি স্যার।" ক্লাসের অন্য কেউ ধরার আগেই অয়ন হনহন করে হাঁটে, তাঁকে যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে পালাতে হবে। গেটের কাছে এসে রিমিনের কাছে ধরা পড়ে সে। রিমিন সিএসইতেই পড়ে। কিন্তু ওর থেকে এক ব্যাচ জুনিয়র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এমন পাগলের মতন হাঁটছ কেন? ফোন বন্ধ ছিল কেন? কী হয়েছে তোমার, এতদিন আসোনি কেন?" সবার মতো একই প্রশ্ন করে রিমিন। রিমিনকে এড়াতে পারে না অয়ন। রিমিনকে নিয়ে বুয়েটের কাছে একটা ক্যাফেতে বসে। ওরা সাধারণত এখানেই দেখা করত কিংবা এখানে এসে অন্য কোথাও যেত। রিমিন কফি আর স্যান্ডউইচের অর্ডার দিয়ে অয়নের দিকে তাকায়।

"এখন বলো সবকিছু।" রিমিন আলতো করে অয়নের হাত ধরে।

"তুমি তো জানো আমার লেখালেখির কথা। হঠাৎ কী যেন হলো মনে হলো এই ফেব্রুয়ারিতেই বই বের করতে হবে একটা। মনে হলো পড়াশোনা তো পরেও করতে পারব। আর তাছাড়া ডিগ্রি নিতেই হবে কেন? অনেক বড় বড় লেখকই ডিগ্রি ছাড়াই এমন লেখা লিখেছেন যা তাঁদের অমর করে রেখেছে।"

"তুমি কি এখনো তাই মনে করো?"

"না, আমার ভুল ভেঙেছে রিমিন। এখন থেকে আমি নিয়মিত ক্লাস করব আর পরীক্ষাও দেব।" অনেকটা কৈফিয়তের ভঙ্গিতে জবাব দেয় অয়ন।

"তুমি তো পরীক্ষা দিতে পারবে না অয়ন। পরীক্ষা তিন মাস পর।"

"আমি পারব, আমি পারব। সব স্যারদের সাথে দেখা করে তাঁদের অনুমতি আর হেল্প নেব।"

রিমিন ফ্যাকাসে মুখে হাসার চেষ্টা করে–

"না অয়ন, হবে না। পরীক্ষা দিলে তোমার রেজাল্ট খুবই খারাপ হবে। তুমি যদি স্যারদের আগে থেকে কিছু বলতে তাহলে হয়তো তাঁরা চেষ্টা করতেন।" রিমিন মাথা নিচু করে বলে, "আমার চারদিক থেকে বিয়ের প্রোপোজাল আসছে। এতদিন তোমার মেরিটের কথা বলে, রেজাল্টের কথা বলে সব আটকে রেখেছিলাম। কিন্তু এখন তো আর বলতে পারব না তুমি ব্যাচের বেস্ট স্টুডেন্ট। বাবা-মা আমার কথা শুনবেন না।"

ব্যাগ থেকে টিস্যু বের করে ও চোখ মোছে। রিমিন উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। ইংলিশ মিডিয়াম থেকে ও লেভেল করেছিল। ওই অবস্থান থেকে যেসব ছাত্র-ছাত্রী আসে তারা খুব সহজে বুয়েট বা পাবলিক ভার্সিটির সহপাঠীদের সাথে মিশতে পারে না। বুয়েটে ভর্তি হবার পর অয়ন তাকে অনেক হেল্প করেছিল। সেখান থেকেই তাদের পরিচয়। এ ধরনের ফ্যামিলির সাথে তার বিয়ের প্রশ্নই আসে না। অয়ন ভালো ছাত্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলে তাদের বিয়ে হতেও পারে, এরকম একটা স্বপ্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখেছিল রিমিন। প্রথম থেকেই ধরে নিয়েছিল অয়ন তার ব্যাপারে আগ্রহী। অয়ন চেষ্টা করেও রিমিনের ভুল ধারণাটা ভাঙাতে পারেনি। নিজে থেকে দুর্ব্যবহার করতে পারেনি। সে এবার প্রাণপণে শেষ চেষ্টাটা করে–

"তুমি বোধ হয় খেয়াল করোনি রিমিন। আমাদের স্বপ্নগুলো আলাদা। আমরা প্রায় মিসফিটই বলা চলে। আমরা একজন আরেকজনকে খুব একটা ভালে চিনি বলেও মনে হয় না। তুমি খুবই সক্ষম, মিষ্টি একটা মেয়ে। আর আমি অনিশ্চয়তায় ঝাঁপ দেয়া একজন। তোমার গন্তব্য কেবল আমি হতে পারি না।"

রিমিন ধরা গলায় বলে–"আমার একটা ক্লাস মিস করেছি, এর পরেরটা করতেই হবে।"

"পরের ক্লাসটা না করলে হয় না? আমরা তো আগেও ক্লাস বাদ দিয়ে ঘুরেছি।"

"হ্যাঁ, ঘুরেছি, কিন্তু এ কয়েক মাসে অনেক কিছু বদলে গেছে অয়ন, আমি উঠছি।" রিমিন চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়।

অয়ন হাঁটতে হাঁটতে রমনা পার্কে চলে আসে। একটা খালি জায়গা খোঁজে বসার জন্য। শেষ পর্যন্ত একটা বিশাল গাছের নিচে শুয়ে পড়ে। নিজের বোকামি আর ভুলের জন্যে কান্না পায় ওর। কেন যে তার মাথায় লেখক হবার ভূত চেপেছিল। স্বার্থপরের মতন শুধু নিজের কথাই ভেবেছে। তার উপন্যাসের কোথাও বোধ হয় সে লিখেছিল–

"ছোটবেলায় বেশির ভাগ ছেলেমেয়েই অন্ধকারকে খুব ভয় পায়। রাতে লাইট বন্ধ করলেই মনে হয়, খাটের নিচে ভয়ংকর কিছু লুকিয়ে আছে, অথবা জানালা দিয়ে ভূতজাতীয় কিছু তখনই ঢুকে পড়বে। কিন্তু কেউ একজন আলো জ্বালালেই দেখা যায় তাদের সব ধারণা ভুল। কোথাও ভয়ংকর কিছু লুকিয়ে নেই, বা সূর্যের আলোর সঙ্গে সঙ্গে সব ভয় কেটে যায়। কিন্তু মনের ভেতর যদি একবার অন্ধকার ঢুকে যায়, তাকে দূর করা প্রায় অসাধ্য।"

অয়নের মনের ভেতরটা এখন অন্ধকারে ঢাকা। মিথ্যে কথা বলে বাসার সবাইকে স্বপ্ন দেখিয়ে সে স্বার্থপরের মতো একান্ত নিজের একটি ইচ্ছেকে প্রাধান্য দিয়েছিল। এখন কেমন করে সে আঁধার দূর করবে? কেউ কি তাকে আর বিশ্বাস করবে? কেন সে এমন অন্যায় কাজ করল? অনেকক্ষণ শুয়ে শুয়ে চিন্তা করে নিজেকে আরো ঘৃণা করতে থাকে অয়ন। তিনটার দিকে উঠে জারাদের বাসার দিকে রওনা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জারার মা অয়নকে দেখে চমকে ওঠেন।

"কী হয়েছে তোমার অয়ন? চোখমুখ কেমন যেন লাগছে, তুমি কি অসুস্থ? গত সপ্তাহেও আসোনি।" অয়ন উত্তর না দিয়ে ভেতরে ঢুকে বলে

"একটু শরীর খারাপ ছিল। এখন ভালো আছি আন্টি।"

রুমানা শরীফ বলেন–

"না না, তুমি এখনো অসুস্থ। জারাকে আজকে পড়াতে হবে না। তুমি একটু বসে তো।" তিনি ভেতরে চলে যান। কিছুক্ষণ পরেই ওদের বুয়া ট্রেতে করে ফলের রস আর একটা স্যান্ডউইচ নিয়ে ঢোকে। পেছনে রুমানা শরীফ।

"একটু খেয়ে নাও তো বাবা।" বলেই তিনি একটি খাম গুঁজে দেন অয়নের হাতে। তোমার গত মাসের টাকাটা।

"কিন্তু গত মাসের অর্ধেক সময়ই তো আসিনি আমি।"

"তাতে কী? মানুষের অসুখ-বিসুখ হলে কি কাজে যায়? জারাকে এখন আমিই পড়াচ্ছি। তুমি সুস্থ হলে আবার আসবে, কেমন?" তিনি অয়নের মাথায় হাত রেখে বলেন। মনে হচ্ছে কোনো দেবী আকাশ থেকে নেমে এসেছে অয়নের কাছে। হাতের তালু দিয়ে চোখ মোছে সে। অয়ন যতক্ষণ খাবার শেষ না করে রুমানা শরীফ ততক্ষণ পর্যন্ত বসে থাকেন। তারপর বলেন–

"যাও, বাসায় যেয়ে রেস্ট নাও। পারলে একজন ভালো ডাক্তার দেখাবে।" বলে তিনি আরো দু হাজার টাকা গুঁজে দেন অয়নের হাতে।

"না না, আমার আর টাকা লাগবে না আন্টি।" অয়ন উঠে দাঁড়িয়ে বলে। কিন্তু উনি টাকা ফেরত না নিয়ে অয়নকে বলেন–

"যাও তো বাবা, বাসায় যাও।" বাইরে এসে অয়ন খাম খুলে টাকা গোনে। পুরো মাসের টাকাটাই দিয়েছেন। সঙ্গে আরো দুহাজার টাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথচ ও মাসে দু সপ্তাহও পড়ায়নি। এত ভালো মানুষ কেমন করে হয়? রাইসাদের বাসায় গিয়ে কলবেল টেপে অয়ন। রাইসাই দরজা খোলে।

"কেমন আছ রাইসা? স্যরি, অনেক দিন আসতে পারিনি। তোমার কি খুব অসুবিধা হয়েছে?" রাইসা মাথা নেড়ে বলে–

"নো স্যার।" অয়ন পড়ার টেবিলের কাছে যেতেই ফারজানা খান কোমরে দুহাত দিয়ে বলেন–

"ও মা, তুমি এতদিন আসোনি কেন? রাইসার ক্লাস টেস্ট ছিল। কী যে খারাপ অবস্থা গিয়েছে!"

"আমার জ্বর হয়েছিল আন্টি।"

"রাইসা, বই-খাতা নিয়ে এসো।" ফারজানা খান বলেন। অয়ন একটু ইতস্তত করে বলে–

"আসলে আজকে আমি পড়াতে পারব না, শরীরটা এখনো পুরোপুরি ভালো হয়নি।"

"ও, আচ্ছা, একটু বসো।" তিনি খুব দ্রুত ভেতরে চলে যান।

"বসেন স্যার।" রাইসা বলে। পাশের ঘর থেকে মোবাইলের রিংটোন শোনা যায়। কেউ বোধ হয় ফোন করেছে ফারজানা খানকে। ফারজানা খানের কথা শোনা যায়।

"আর বলো না, রাইসার ওই টিচারটা এসেছে এতদিন পর। চোখমুখ যেন কেমন লাগছে, আল্লায় জানে ড্রাগ ধরেছে কিনা। ভাবি, একটু পরে আপনাকে ফোন করব।" ফারজানা খান অয়নের হাতে একটি খাম দিয়ে বলেন–

"তোমাকে আর আসতে হবে না। নিজের যত্ন নাও।"

"রাইসার অসুবিধা হবে না?"

"ওকে কোচিংয়ে ভর্তি করিয়ে দেব।"

"জি আচ্ছা। আমি তাহলে আসি আন্টি? রাইসা, মন দিয়ে পড়ো। তুমি অনেক শার্প। মেক গুড ইউজ অফ ইয়োর হেড।" রাইসাদের বাসা থেকে বের হয়ে খামটা খোলে অয়ন। যা ভেবেছিল তাই–ফারজানা খান তাঁকে দুই সপ্তাহের টাকা দিয়েছেন। ঠিকই আছে, বেশি কেন দেবেন?

অয়ন সামনের আইল্যান্ডের নিচু দেয়ালে বসে পড়ে। ঠিক কতক্ষণ বসে ছিল অয়ন জানে না। অন্ধকারের মধ্যে একজন পুলিশ এসে দাঁড়িয়ে তার মুখের ওপর টর্চের আলো ফেলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আপনি এত রাতে এখানে কী করছেন?" অয়ন একটু থতমত খেয়ে যায়। সে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিল কিছুক্ষণ।

"কিছু না। এমনি বসে আছি।"

"এমনি এমনি তো কেউ আর বসে থাকে না। কারো জন্যে অপেক্ষা করছেন নাকি?" অয়ন উঠে দাঁড়িয়ে বলে–

"অপেক্ষা করার মতন আমার কেউ নেই।" তারপর সে হনহন করে অন্যদিকের ফুটপাথে উঠে আসে। বাসায় ফেরে রাত এগারোটার দিকে। নিশি দরজা খুলে দেয়। নাজমা বেগম টের পেয়ে পাশের কামরা থেকে নিচু শক্ত গলায় বলে ওঠেন–

"তোমার খাবার টেবিলে ঢাকা দেওয়া আছে।" নাজমা বেগম যখন ছেলেমেয়েদের ওপর কোনো ব্যাপারে রেগে থাকেন তখন তাদেরকে "তুমি" বলে সম্বোধন করেন।

অয়ন রাতের খাবার খায় না। হাতমুখ ধুয়ে শুয়ে পড়ে। ভোর হতেই ও বাসা থেকে বের হয়ে যায়। বুয়েটের দিকে হাঁটতে থাকে সে। কিছুক্ষণ হেঁটেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। রাস্তার পাশে একটা চায়ের দোকানে বসে।

"এক কাপ চা হবে ছোট ভাই?"

"চিনি কয় চামুচ দিমু ভাইজান?" আট-নয় বছরের ক্লান্ত চোখের ছেলেটা হাসিমুখে জিজ্ঞেস করে।

"দু চামচ চিনি দিলেই হবে। আর কিছু আছে খাবার মতন?"

"পরোটা আর ভাজি পাইবেন পনেরো মিনিট পর।" খুপরির ভেতর থেকে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের এক প্রৌঢ় বের হয়ে বলে।

"আচ্ছা আমি বসছি।"

"চা তো হইয়া গেছে ভাইজান।"

"ঠিক আছে দাও। পরে নাহয় আরেক কাপ খাব।" অয়ন হাত বাড়িয়ে দিনের প্রথম চায়ে চুমুক দেয় এবং অবাক হয়ে লক্ষ করে মাত্র সাড়ে ছয়টা বেজেছে ঘড়িতে।

রাস্তাগুলো এখনো ফাঁকা, গাছগুলোকে অন্যদিনের চাইতে মনমরা বলে মনে হয় তার। চা দোকানের লোক দুজনকে দেখে মনে হয় কত শান্তিতে আছে তারা। আর অয়ন পড়েছে এক অতলান্তিক সাগরের ভেতর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাওয়া শেষ করে অয়ন একটা রিকশা নেয়। জামান স্যারকে ধরতে হবে। সাড়ে আটটার ভেতরে সে পৌঁছে যায় বুয়েটে এবং জামান সাহেবের রুমের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। স্যার আসেন নটার একটু পরে।

"কী ব্যাপার অয়ন তোমাকে না আমি কালকে বলেছিলাম আমার সাথে দেখা করতে?"

"স্যার একটু অসুবিধা ছিল।"

উনি তালা খুলতে খুলতে বলেন–"হোয়াটস রং উইথ ইউ গাইজ, নাওয়াডেজ?" ড. ইউসুফ জামান নিজের চেয়ারে বসেন। অয়নকেও সামনের চেয়ারে বসতে বলেন।

"সত্যি করে বলো তো তোমার কী হয়েছিল?"

"স্যার, আমি বেশ কিছুদিন অসুস্থ ছিলাম।"

"তাই বলে তুমি একটা খবরও দেবে না আমাদের কাউকে। কতবার তোমার বন্ধুদের কাছে তোমার কথা জানতে চেয়েছি। কেউ কিছু বলতে পারেনি।"

"স্যার, আমি কি ফাইনাল পরীক্ষাটা দিতে পারব?"

"পারবে, অবশ্যই পারবে। কিন্তু ফাইনাল ইয়ারের প্রথম সেমিস্টারে তো তুমি প্রায় তিন মাস ক্লাস করোনি। এখন কি পারবে, বাকি ক্লাসগুলো করে পরীক্ষা দিতে? অ্যাটেন্ডেসের ব্যাপারটা নাহয় আমরা বিবেচনা করতে পারি। তুমি চিন্তা করে দেখো। আর লেবেল ওয়ানের পরীক্ষা যদি পরের সেমিস্টারে দাও তাহলে কিন্তু তুমি যত ভালো পরীক্ষাই দাওনা কেন ওগুলোর রেজাল্ট জিপিএ চার এর অনেক কম হবে। আমরা তো ভেবেছিলাম এবারের লিনাস টরভাল্ড গোল্ড মেডেলটা তুমিই পাবে।" অয়ন একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে উঠে দাঁড়িয়ে বলে–

"আসি স্যার।" দেরি না করে সে মাথা নিচু করে বাইরে চলে আসে। কোথায় যাবে সে এখন? ভাবতে ভাবতে রিকশা নিয়ে সে রমনা পার্কে চলে আসে। দুচোখে রাজ্যের ঘুম ভর করেছে। একটা গাছের নিচে শুয়ে পড়ে অয়ন। শোবার সঙ্গে সঙ্গেই সব ঘুম কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়। মাথার মধ্যে নানারকম চিন্তা ঘোরে। কখনো লিনিয়ার কথা, কখনো পরীক্ষার কথা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনো উপন্যাসের কথা মনে হতে থাকে। ভাবতে ভাবতে ঘুম এসে ভর করে তার চোখে। একসময় ঘুমিয়েই পড়ে। ঘুম থেকে উঠে দেখে চারদিকে অন্ধকার। তাড়াতাড়ি পার্ক থেকে বের হয়ে বাসার দিকে রওনা হয় সে।

বাসায় এসে শুয়ে পড়ে অয়ন। বাসায় একটা কেমন থমথমে পরিস্থিতি। এর জন্যে দায়ী সে নিজেই। ভালো লাগে না, কিছু ভালো লাগে না তার। বাইরে থেকে এসে সাধারণত ও হাত-মুখ ধোয়, কাপড় বদলায়। আজ সে বাইরের কাপড় নিয়েই বিছানায় শুয়ে পড়ে। বাইরে ওর তেমন ঠান্ডা লাগছিল না। কিন্তু বিছানায় শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হয় মাঘ মাসের শীত পড়েছে। ও একটা চাদরের ওপরে মোটা একটা কাঁথা দিয়ে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নোমান চৌধুরী ঘুমাচ্ছেন। রহমত মিয়া একপাশে বসে ভাবে—"আল্লাহ তায়ালার কী যে বিচার! এই যে এই খালুজান মানুষটা বালা, কিন্তু খিদার কষ্ট কী সে জানে না। বাইরে যহন গরম থাহে তহন এই ঘরের মইধ্যে ঠান্ডা বাতাস বাইরনের মেশিন দিয়া ঘর ঠান্ডা কইরা দেয়। কী আরামে ঘুমাইতাছে! আবার যহন ঠান্ডা পড়ে তহন আরেকটা মেশিন চালায়। হেইডা দিয়া ঘর গরম হইয়া যায়। আহারে! আমার ছাওয়ালডা কেমন যে আছে। হের লাইগা প্যাট পুড়তেছে। হেয় কী খাইতাছে আর না খাইতাছে জানিও না। বউটা হইছে বড় বদ, খালি টেহা চাইয়া চিডি লেহে। দেশে থাকতে তারে একটা রাও করতে দিত না। হেও চুপ কইরা থাকত। মইধ্যে মইধ্যে মন চায় আলমারি খুইল্লা টেকা-পয়সা, সোনা-দানা লইয়া ভাগতে। ইস্টিলের এই আলমারির চাবি কই থোয় যে খালুজান! একদিন ম্যানেজার ব্যাটার লগে গাড়িত কইরা বাইরে গেছিল খালুজান। তহন খাটের লগের ছুডো টেবিলে একটা চাবি পাইছিল। আলমারি খুইল্লা চোক্কে ধান্ধা লাইগা যায়। ড্রয়ারের ওপর ড্রয়ার। বড়, মাইজ্যা, ছোট—ম্যালা মাপের ড্রয়ার। একটার মাঝে খালি কাগুজ। আরেকটায় কত জাতের যে ফুডু। মনে অয় খালুজানের বউয়ের লগে আর পোলাদের লগে। একটার ভিতরে খালি কাপড়, শাড়ি আর শাড়ি। একটা খুইল্লা মাথা-মোথায় ঘুর লাইগ্গা যায়। শন্যের গয়না, কত জাতের যে নকশা করা।"

হঠাৎ টের পায় পাশে ফুলি। এ বাড়িতে রান্না করছে গত বিশ বছর ধরে। সে একটা চিৎকার দেয়। "ও মাগো!" তারপরেই দৌড়ে ঘরের ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়ে আলমারির কাছে আসে। লোভে তার চোখ জ্বলজ্বল করছে।

রহমত মিয়া তার দিকে ফিরে বলে—"না।" এত জোর দিয়ে বলে যে ফুলি কয়েক সেকেন্ডের জন্যে হলেও ভয় পায়। ভয় কাটিয়ে ফুলি দু হাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠিয়ে বাচ্চাদের বোঝানোর ভঙ্গিতে বলে—"আরে আমরা দুইজনেই তো সমান সমান ভাগ কইরা নিমু।" বলে সে আঁচল পেতে ধরে। রহমত মিয়া তাকে এক ঝটকায় সরিয়ে দেয় আলমারির কাছ থেকে এবং চোখের পলকে আলমারিটা লক করে ফেলে।

"কী হইল তোমার রহমত? এইগুলা নিলে সারাজীবন আর কোথাও কাজ করনের দরকার হইব না।"

"না, আমি চুর না। মান-সম্মান নিয়া বাঁচতে চাই আমি।"

"তুমি তোমার ওই মান-সম্মান লইয়া পানি খাও। আমারে চাবিটা দাও।"

"না, না চাইতেই আল্লাহ আমারে অনেক শৈন্য দিছে।"

"শৈন্য আবার কী?"

"আল্লাহর রহমত।" ফুলি হাসে আর বলে—

"তোমার শৈন্য আছে, আমার নাই। আমার স্বর্ণ লাগব। আলমারি খুলো তাড়াতাড়ি।" রহমত মিয়া আবার চিৎকার করে বলে ওঠে—

"আমি চুর না, আমি চুর না।" সে দৌড়ে দরজার ছিটকিনি খুলে দেয়। বলে—"বাইর হইয়া যাও।"

তার কথায় কী ছিল বোঝে না, তবে ভয় পেয়ে ফুলি বের হয়ে যায়। রহমত মিয়া ড্রয়ারে চাবির গোছা রেখে মেঝেতে বসে বিড়বিড় করে। "আমি চুর হইতাম চাই না। ছুড়ুবেলায় কেত্যার বাগান থেইকা প্যাটের জন্যে এইডা-সেইডা চুরি করছিলাম। এহন আমি ভালা আছি। এহন আমার একলার প্যাটের জন্য চুরি করার দরকার নাই।"

নোমান চৌধুরী ঘরে ঢুকে দেখেন রহমত মিয়া দু হাঁটুর মাঝখানে মুখ রেখে বসে আছে। তিনি বিছানায় বসতে বসতে বলেন—

"কী হয়েছে রহমত?"

"কিছু তো না।"

"এদিকে তাকাও তো!" হাঁটু থেকে মুখ তোলে রহমত মিয়া। কাঁদতে কাঁদতে তার চোখ লাল হয়ে আছে।

"তুমি কাঁদছিলে কেন রহমত মিয়া? শরীর খারাপ লাগছে?"

"না খালুজান। আমার পোলাডার জন্য প্যাট পুড়তেছে।"

"তুমি দেশে যেতে চাও?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না, ফুন করলে হেই আইব এইখানে, তই আমার একটা আপিত্যি আছিল।"

"কী ছিল? আপিত্যি আবার কী?

"কইতাছিলাম, আমার পোলাটার দোহানে ইকটু কিছু জিনিসপত্র দিয়া সাজাইবার চাইছিলাম।"

"তা বেশ তো। কী কী লাগবে দোকানে বলো। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।" রহমত মিয়া উঠে নোমান সাহেবের পা ছুঁয়ে তিনবার সালাম করে।

"আরে এসব আবার কী? কয়েকটা জিনিসের জন্য সালাম করা লাগবে না।" রহমত মিয়া এসি দেওয়া রুমে বসেও ঘামছিল। লোভ, কী লোভ ওই আলমারিতে লুকানো। সে যে নিজেকে লোভ থেকে, পাপ থেকে সরাতে পেরেছে তার জন্য আল্লাহকে ধন্যবাদ জানায়। "আইজ থাইকাই আমি নামাজ পড়ন শুরু করমু। হেই কুনকালে মায়ে শিখাইছিল। মায়াগো, তুমি আমারে দেইখা রাইখো মায়া!" রহমত মনে মনে বলে। "বাপ তো পুতেরে দেখতে পারে নাই। হেই কেমনে চিনব আমারে?" তার চোখ ভিজে ওঠে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একতলায় নেমে রহমত মিতুনকে ডাকে। "আম্মায় কী বাসায় আছে?"

"হ্যাঁ, রহমত ভাই। এই যে আমি এসে গিয়েছি।"

"কোনো কিছু লিখতে হবে বা পড়তে হবে রহমত চাচা?" মিতুন জানে কোনো লেখাপড়ার কাজ হলেই রহমত তাদের দরজায় চলে আসে। আর প্রথমেই নিশ্চিত হয়ে নেয় নাজমা বাসায় আছে কি না। না থাকলে পরে আসবে বলে চলে যায়।

"আমার একটা লিস্টি লিইখ্যা দেওন লাগব আফা"।

"একটু দাঁড়ান।" মিতুন কাগজ কলমের খোঁজে উঠে যায়।

একটু পর রহমত লিস্ট নিয়ে নোমান চৌধুরীর কাছে এসে হাজির হয়।

"খালুজান লিইখ্যা আনছি।"

"বলো দেখি কী কী লিখে এনেছ।" রহমত মুখস্থ বলতে থাকে–

"ছয়ডা পেলাস্টিকের লাল চেয়ার, এক ডরজন কাপ-পিরিচ, এক ডরজন চায়ের চামচ, আরেকটা জিনিস চাই কইতে ডর লাগতাছে।" কান ঘষতে ঘষতে ইতস্তত করে রহমত–

"আরে কী বলো। না পারলে দাও, আমি পড়ে নিচ্ছি।"

"একটা তের ইঞ্চি রঙিন টিভি।" রহমত একটু ভয়ে ভয়ে বলে।

"লাল প্লাস্টিকের চেয়ার কেন, অন্য রঙের হলে কী অসুবিধা?"

"অসুবিধা কিছু নাই। কিন্তু ওই যে আপনার টেলিবিশনে দেখছিলাম। অনেক সোন্দর খালুজান।"

"আচ্ছা বুঝলাম, লাল রং তোমার প্রিয়। এত ছোট টিভি দিয়ে দোকানে কী হবে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মইধ্যে মইধ্যে টিলিবিশনে নাটক হয়, খেলা দেহায়, তহন কাস্টমাররা হগলতেই চেয়ারম্যান বাড়িত যায়গা। তাই, ছুড়ু হোক, দুকানে যদি একখান ওই জিনিস থাকে কাস্টমাররা আর যাইত না। বুদ্ধিটা বালা না?"

"এসব কি তোমার ছেলে বলেছে?"

"না, এইটা আমার বুদ্ধি খালুজান।"

নোমান চৌধুরী একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। সবাই ছেলেমেয়েদের নিয়ে কত ভাবে। তিনি প্রায় তিন বছর হলো ছেলেমেয়েদের সাথে ভালো করে কথাও বলেন না। অথচ ওরা প্রতিদিন ফোন করে তার খবর নেয়। শুধু তাকে নয়, ম্যানেজার সালেহ আহমদ থেকে শুরু করে রহমতকেও ফোন করে শুধু তার খবর নেওয়ার জন্যে।

দীর্ঘদিন পর নোমান চৌধুরী তার বড় ছেলে সায়ানকে ফোন করেন। সায়ান ফোন ধরে চেঁচিয়ে উঠে বলে—

"আব্বু তুমি কত বছর পর ফোন করলে, আমার যে কেমন লাগছে! তুমি ঠিক আছো তো?" সায়ানের গলা ফোনের ওপাশ থেকে কেমন যেন ধরা ধরা লাগে।

"খোকন (তিনি আর মোনা দুজনেই সায়ানকে খোকন ডাকতেন), কাঁদে না, মন খারাপ করে না সোনা। আমি আসলে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। এখন থেকে আমি নিজেকে পুরোপুরি সুস্থ মনে করব।"

"ল্যাপটপের স্কাইপটা অন করো না আব্বু প্লিজ, তোমাকে একটু দেখব।"

"আচ্ছা করছি।" বলেই তিনি টেবিল থেকে ল্যাপটপটা তার কোলে নেন। "রাজ্যের ধুলা জমে আছে দেখি এটায়।" বিড়বিড় করে বলেন নোমান চৌধুরী। স্কাইপ অন করার কয়েক মিনিটের মধ্যে সায়ান, নিয়ারা আর ইরিনাকে দেখা যায় পর্দায়। নিয়ারা বলে ওঠে—

"দাদ্দাদ, তুমি ভালো হয়ে গেছ। ইউ আর নট সিক এনিমোর?" পাঁচ বছরের নিয়ারা বাংলা-ইংরেজি মিলিয়ে কথা বলতে থাকে। তা তো হবেই, ভাবেন নোমান চৌধুরী। ও আর বাংলা শেখার সময় কখন পেল?

নিয়ারাকে পাশে ঠেলে সায়ান আর সামান্থা একসাথে হইচই করে ওঠে—

"তোমাকে অনেক ফ্রেশ দেখাচ্ছে আব্বু।" সামান্থা বলে। মা-বাবাকে দুহাত দিয়ে সরিয়ে ছোট্ট নিয়ারা দুহাত দিয়ে জায়গা করে নেয় ওদের মাঝখানে।

"এটা মাই দাদ্দাদ"—স্ক্রিনের একেবারে কাছে এসে বলে সে। ব্যাপারটা কী জানার জন্যে রহমত মিয়াও উঠে আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"রহমত ভাই কেমন আছেন আপনি?" সায়ান জিজ্ঞেস করে।

"বালা আছি গো পুত, বালা আছি।" তার চোখে রাজ্যের বিস্ময়। 'মানুষ কত জাতের জিনিসই না বানায় থুইছে'—মনে মনে ভাবে রহমত আর হাঁ করে তাকিয়ে থাকে ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে। 'বাড়ির বউ প্যান্ট-শার্ট পইরা আছে লইজ্জা করতেছে'—রহমত মিয়া উঠে আগের জায়গায় বসে।

অনেকক্ষণ কথা বলে তারা। তারপর গুডনাইট বলে স্কাইপ বন্ধ করে। ইরিনা বলে—

"এবার দেশে গিয়ে আব্বুকে এখানে এনেই রাখতে হবে। আর ওই বাড়িটা ডেভেলপারের কাছে দিয়ে দেয়াই ভালো। দেশে কেউ না থাকলে এতবড় বাড়ি রেখে লাভ কী বলো।" সায়ান মাথা নেড়ে স্ত্রীকে সমর্থন করে।

নোমান চৌধুরী রায়ানকেও ফোন করেন। ওপাশ থেকে কোনো উত্তর আসে না। ওদের ওখানে এখন অনেক রাত। "বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই"—নোমান চৌধুরী বিড়বিড় করে বলেন।

রহমত মিয়া ছেলেকে ফোন করার চেষ্টা করে আর বসে বসে ভাবে। "ইতা কী দেখলাম গো। কম্পুটারির মইদ্যে এম্রিকা বিবাকতা দেহা যায়। খালুজানের বড়পুলা, মাইয়া, বউ—সবতারে দেখলাম। কী আজব! আহারে যদি আমার মতিরে একবার দেখবার পাইতাম এই রহম।"

"ও বাপধন ভালো আছোস নি। ফুনটুন করোস না কেন?"

"বাবা আমার কততা কাম দুকানডার মইদ্যে। হের মইদ্যে তোমার বউ আবার গরু রাখছে।"

"তরে না কইছি রাখাইন গরু না নিতে।"

"আমি কিতা কই হুনে না। হের সাথে কেউ কতায় পারে। তুমি তারে দেখছ না?"

"আইচ্ছা বাজান তুই কাইলদিন পর আইবি এইহানে।"

"কেন কিতা হইছে। সবতা খুইল্লা কও।"

"আমি আগাম কিছু কইতে পারতাম না। আইলে তোর লাভ না হইক লুকসান কিছুতা হইত না।" রহমত মিয়া রাগ করে ফোনের লাইন কেটে দেয়। সে শুনেছে খালুজান ফোনে কাকে যেন বলেছেন কালকে তের ইঞ্চি একটা কালার টিভি নিয়ে আসতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ও খালুজান, বড়ই আজব জিনিস দেখলাম।" নোমান চৌধুরী হাসেন।

"টাকা আর ঠিক যন্ত্রপাতি থাকলে অনেক আজব জিনিসই দেখা যায়।"

"যন্ত্র না অইক আমার তো টাকা অইছে খালুজান।"

"তাই নাকি? কত টাকা হয়েছে তোমার?"

"মনে করেন গিয়া ৫ হাজার টাকা মাসে ধরলে প্রায় তিন বৎসর তো হইয়া গেছে। তার মইদ্যে পাঁচ ঈদে আপনার পোলারা বিশ হাজার কইরা টাহা দিছে। আবার যহন দেশে আইছে তহনো বিরাট টাহা দিছে। সব ম্যানেজার সাবে রাইখা দিছে ব্যাংকে।"

"এত টাকা দিয়ে কী করবে তুমি?"

"দেশে আমার একটা টিনের ঘর আছে। ওইখানে পাকা ঘর তুলতাম। আর একখান রান্ধার ঘর তুলতাম।"

"তোমার ছেলের ঘর পাকা করবে না?"

"দেহি টেহায় যদি কুলায়।"

"পাকা ঘর দিয়ে কী করবে তুমি?" রহমতের কালো মুখ লজ্জায় বেগুনি হয়ে যায়।

"এত লজ্জা পাচ্ছ কেন রহমত মিয়া, কী হয়েছে?"

"একটা বিয়া করমু খালুজান।"

"কি? বউ ঠিক করা আছে নাকি?"

"হ। আমার পারুল। আমার গ্যাদাকালের বন্ধু।"

"এত দিন বিয়ে কর নাই কেন তাকে?

"হের বিয়া অইয়া গেছিল এক বুড়ার সাথে। বুইড়ার চার নম্বর বউ আছিল সে। রংটা একটু শ্যামলা কিসিমের আছিল তো। তয় চোখমুখ এক্কারে খালাম্মার লাহান আছিল।"

"তো এখন তুমি তাকে কেমন করে বিয়ে করবে?"

"হের বুইড়া জামাই মইরা গেছে অনেক আগে। মতির মাই দেখতে অনেক সোন্দর মোন্দর ছিল। ওই যে খালাম্মার ছবিটা ঝুলতাছে একদম ওইটার মতন। কিন্তুক পারুলরে দ্যাখতে আন্ধারে চান্দের মতন লাগে।"

"তা পারুলকে বিয়েতে কী দেবে তুমি?" রহমত মিয়া লজ্জা পেয়ে বলল—

"একটা সোনার নাকফুল দেওয়ার ইচ্ছা।"

"আর কিছুই দেবে না? শুধুই নাকফুল?"

"কিছু টাকা তো তুইলা রাখন লাগব পরের খাওন-পরনের জন্য।"

"রহমত মিয়া, তুমি যখন দেশে যাবে আমি তখন তোমাকে এক হাজার টাকা করে পেনশন দেব। আর আমি তোমার বউ পারুলকে কী দেব জানো?"

"আফনে আবার কিতা দিবেন?"

"একটা গলার সোনার চেন দেব। আর একটা লাল বেনারসি শাড়ি।" রহমত মিয়া উঠে নোমান চৌধুরীকে সালাম করে।

"আপনের মতন মানুষ হয় না।"

"তাহলে তো তুমি এখনই চলে যেতে পারো।" হেসে ওঠেন নোমান সাহেব।

"আফনেরে এই রহম ফালাইয়া কি আমি যাইতে পারি?" দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে তাকায় রহমত—"খালুজান কিছুতা লাগত?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অয়ন গত দুদিন থেকে ঘুমাচ্ছেই। নিশি আর মিতুন ছাড়া কেউ তাকে জাগানোর চেষ্টা করেনি। তিনদিনের মাথায় নিশি অয়নের কপালে হাত রেখে চমকে উঠল। তার কপাল ছুঁয়ে মনে হচ্ছে এখানে যেন চুলা জ্বলছে। সে দৌড়ে নাজমা বেগমকে ডাকে।

"মা মা, ভাইয়ার প্রচণ্ড জ্বর হয়েছে। ঘুম থেকে ওঠেনি এখনো।"

নাজমা বেগম বলেন–

"তো আমি কী করব। ঘুম থেকে উঠিয়ে দুটো প্যারাসিটামল খাইয়ে দে। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"মা তুমি কিছু বুঝতে পারছ না। ভাইয়াকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার।"

"তোর যখন এতই দরদ তুই নিয়ে যা।"

"মা!" নিশি চিৎকার করে ওঠে। "ভাইয়ার এই অবস্থার জন্য তুমি দায়ী, তুমি কি সেটা জানো না?"

"আমি কী করেছি? বল, আমি কী করেছি?"

"আমি কি চোখের সামনে দেখিনি সেই ছোটবেলা থেকে যখন ভাইয়া স্কুলে যাওয়া শুরু করে তখন থেকেই তুমি তাকে পড়াশোনার কথা বলতে। প্রতিটা পরীক্ষাতেই তার প্রথম হওয়া চাই। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো দাম দাওনি।" নিশি ছুটে আসে আবার অয়নের ঘরে। আরেকবার ডাকে–

"ভাইয়া ভাইয়া, ওঠ তুই। ও ভাইয়া।" বলতে বলতে ওর চোখ ভিজে যায়। কী করবে বুঝতে না পেরে নিশি দৌড়ে দোতলায় যায় নোমান চৌধুরীর কাছে।

AMARBOI.COM

"সোনাদাদু, ভাইয়ার অনেক জ্বর। তিন দিন থেকে। এর মধ্যে একবারও ঘুম থেকে ভালোমতো ওঠেনি। কথাও বলছে না ঠিকমতো। কী করি বলো তো?"

"তাই নাকি? কয়েক দিন মিতুন বুঝি এ জন্যেই আসেনি?" ব্যস্ত হয়ে সোনাদাদু ওয়াকিং স্টিকে ভর করে উঠে দাঁড়ান। "আমি একটা অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করছি।"

কিছুক্ষণের ভেতরেই অ্যাম্বুলেন্স চলে আসে। অয়নকে যখন স্ট্রেচারে তোলা হয় ওর মুখ দিয়ে গ্যাজলা বের হচ্ছিল। নিশি আর মিতুনও অ্যাম্বুলেন্সে উঠে বসে। তারা দুজনেই দুপাশ থেকে অয়নকে ধরে "ভাইয়া, ভাইয়া" বলে ডাকতে থাকে। অ্যাম্বুলেন্স গিয়ে থামে একটি প্রাইভেট ক্লিনিকের ভেতর। খুব দ্রুত তাকে এমারজেন্সি রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। নিশি আর মিতুন এমারজেন্সি রিসেপশনের দুটো চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকে। তাদের চোখে-মুখে রাত্রি আর আতঙ্কের ছাপ গাঢ় হয়ে ওঠে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুক্ষণের মধ্যেই অয়নকে ডাক্তাররা ভেতরের একটি রুমে নিয়ে গেলেন। তাদের মধ্যে একজন এসে জিজ্ঞেস করলেন–

"কী হয়েছিল উনার?" আরেকজন দ্রুত তার নাম, বয়স লিখে নিল। "ইমতিয়াজ রহমান। বয়স ২৩ বছর...।" নিশি একটু সংকোচের সঙ্গে উত্তর দেয়।

"ভাইয়া গত কয়দিন ধরে বেশ ঝামেলার ভেতরে ছিল।"

"জ্বর কবে থেকে? ওর তো এখনো বেশ জ্বর।"

"দুই কি তিন দিন হবে।"

"আপনাদের বাড়ির কেউ জানেন না।"

"আসলে আমি ভোরে কলেজে চলে যাই। ফিরতে ফিরতে রাত সাতটা-আটটা বেজে যায়।" মিতুনকে দেখিয়ে বলে–"ও প্রায় সারাদিনই স্কুলে থাকে। তাই...."

"বুঝেছি ঘরের ভেতর থেকে লক করে ঘুমায় তাই তো?" নিশি মাথা নাড়িয়ে বলে–

"জি।"

"কিন্তু বাসায় আর কেউ নেই?"

"আছেন, আমার মা-বাবা দুজনেই আছেন।"

"তারা কিছু জানেন না?"

"বাবা তো অফিসে থাকেন। আর মার শরীরটা কিছুদিন থেকে খুব খারাপ।"

"ঠিক আছে চিন্তা করবেন না। স্যার যখন বলেছেন আমরা যতদূর সম্ভব দেখছি। এখন উনি একটু চোখ মেলেছেন। একটা এমআরআই করতে হবে এক্ষুনি। আরো কয়েকটা ব্লাড টেস্ট করতে হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার চলে যাওয়ার পরপরই চোখে ভারী চশমা পরা একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক এমারজেন্সি রুমে ঢোকেন। আর তার পেছনেই নোমান চৌধুরী আর রহমত মিয়া। নোমান চৌধুরী চশমা পরা ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ভদ্রলোকও ভেতরে চলে যান। রুমে শুধু থাকে নিশি, মিতুন, নোমান চৌধুরী আর রহমত মিয়া। আর ডেস্কের কাছে বসা দুজন তরুণী, মনে হচ্ছে তারা দুজন ডাক্তার না, আর একজন পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের ভদ্রলোকও বসে আছেন। একজন মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে–

"কিছু ইনফরমেশন লাগবে। আর তাছাড়া টাকাও জমা দিতে হবে।"

নোমান চৌধুরী একটি লাঠিতে ভর করে আস্তে আস্তে ডেস্কের কাছে চলে যান।

"নাম লিখেছ? ইমতিয়াজ রহমান।"

"জি স্যার। বাসার ঠিকানা, আরো কিছু ইনফরমেশন লাগবে।"

"আমার নাম নোমান চৌধুরী। আমি ডক্টর ইরফান হকের বন্ধু। কত টাকা জমা দেয়া লাগবে এখন?"

"স্যরি স্যার। আমি আসলে বুঝতে পারিনি।" তরুণী দুজন ব্যস্ত হয়ে নোমান চৌধুরীকে বলেন–

"স্যার আপনি এখানে বসেন। এই চেয়ারগুলো ভালো, আরামের।" নোমান চৌধুরী পকেট থেকে একটি পাঁচশ টাকার বান্ডিল বের করে ডেস্কের ওপরে রাখেন।

"স্যার, এখন না দিলেও চলবে।"

"না না, তা কেন হবে। এটা রেখে দিন আর রিসিটটা আমাকে দিয়ে দিন।" রিসিট নিয়ে নোমান চৌধুরী নিশির পাশে যেয়ে বসেন।

"অনেক ভয় লাগছে দাদু।" মিতুন কেঁদে ফেলে। নিশি অনেক কষ্টে চোখে পানি আটকে রাখে।

"চিন্তা করো না। শহরের সবচেয়ে ভালো ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করানো হচ্ছে।" নোমান সাহেব প্রাণপণে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করতে থাকেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাসায় ফিরে নোমান চৌধুরী চুপচাপ বসে থাকেন। রহমত মিয়া বলে–

"খালুজান, খালুজান! অয়ন কি মইরা যাইব?"

"না না, কীসব আজেবাজে কথা বলো। ওকে পুরোপুরি সুস্থ করার দায়িত্ব আমার। আমিই ওকে প্রায় নিজের হাতে গড়ে তুলেছি। কিন্তু একটা বিরাট বড় ভুলও বোধ হয় করে ফেলেছি। পড়ালেখা আর সাহিত্য যে একসাথেই করা যায়, সেটা কখনো বলা হয়নি ওকে।"

রহমত মিয়া পুরোপুরি বোঝে না নোমান চৌধুরী কী বলছেন। কিন্তু আন্দাজ করতে পারে। রহমত মিয়া দুপুরের খাবার খেয়ে নিয়েছিল আগেই। নোমান চৌধুরী তেমন করে কিছু খেতে পারেননি। এখনো তার মনে একধরনের অস্বস্তিদায়ক শঙ্কা জমাট বেঁধে আছে। মিতুনের কাছ থেকে তিনি সবসময় নিচতলার সব খবর পেতেন। কে কী করছে, কার কী সমস্যা–বলতে গেলে সবই। ব্যাপারটা এতটা সিরিয়াস হয়ে যাবে উনি কখনো ভাবেননি। মানসিকভাবে গা ঝাড়া দিয়ে তিনি মনটাকে একটু হালকা করার চেষ্টা করেন।

"রহমত মিয়া, একটা গল্প শুনবে নাকি?"

"কিতা যে কইন আপনে। এইটা কি গফ-শফ করার সময়?"

"সময় না জানি, তবু মনটাকে ভুলিয়ে রাখার জন্য কিছুটা গল্প নাহয় করি।"

"আইচ্ছা, তাইলে কন।"

"তোমাকে কি কখনো বলেছি তোমার খালাম্মার সাথে কীভাবে আমার পরিচয় হয়?

"না, কন নাই। খালাম্মার অনেক গফই করছুইন কিন্তু এইটা কন নাই।"

"আমি তখন এমবিএ পাস করে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সিতে ভর্তি হয়েছি। সে সময় এ দেশে হাতে গোনা কয়েকজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ছিল। তাদেরই একজন ছিলেন শাফায়াত আহমেদ। শহরে তার খুবই নাম-ডাক ছিল। আমার ইচ্ছা ছিল পড়াশোনা শেষ করে নিজের একটা ফার্ম দেওয়ার। অনেক কষ্টে তাঁর ফোন নাম্বর জোগাড় করে, ফোনে কথা বলে তার বাসায় গেলাম। বাসার দরজা খুলে দিল একটা মেয়ে। ছিপছিপে লম্বা সুন্দরী এক তরুণী। আমাকে খুব কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল মেয়েটি–

"কার কাছে এসেছেন?" আমি বললাম শাফায়াত আহমেদের কাছে।

"তাঁর সাথে তো দেখা করা যাবে না।"

"কিন্তু আমি তো ফোন করে কথা বলে এসেছি। উনিই আমাকে এই সময়ে আসতে বলেছেন।"

"ও আচ্ছা। তাহলে ভেতরে আসুন।" আমাকে একটা সোফায় বসতে বলল তরুণীটি। আমি বসে তাকে বললাম–

"উনাকে কি একটু খবরটা দেওয়া যাবে যে আমি এসেছি। আমার নাম নোমান চৌধুরী।" মেয়েটিও একটি সোফার ওপর বসল।

"আপনি কি জানেন বাবার মাস ছয়েক আগে হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল? ডাক্তার বাবাকে রেস্টে থাকতে বলেছেন।"

আমি বললাম–

'আমি তাঁর বেশি সময় নেব না। তবু আপনি যদি বলেন আমি চলে যাব।' আমার কথা শেষ না হতেই প্রায় ষাট বছর বয়সী সুদর্শন একজন ভদ্রলোক সিঁড়ি বেয়ে ড্রইংরুমে ঢুকলেন।

ও আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা বলিনি ওদের বাসাটা ছিল একতলা - দোতলা মিলিয়ে–রহমতকে বললেন নোমান চৌধুরী। আমি তাঁকে দেখে ঝটপট উঠে দাঁড়ালাম। বললাম–

"স্লামালেকুম স্যার। আমার নাম নোমান চৌধুরী।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। সুমনা বুঝি তোমাকে বসিয়ে রেখেছে।"

"না না, ঠিক তা নয়।"

আমাদের পরিচয়ের শুরুটা এভাবেই হয়েছিল। এরপর থেকে একদিন পরপরই ওদের বাসায় যেতাম। তবে সুমনা আহমেদ, মানে ওই মেয়েটির সাথে কথা বলার জন্যে না। শাফায়াত আহমেদই আমাকে যেতে বলছিলেন। তখনও আমি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হইনি, শিক্ষানবিশী করছি মাত্র। উনি আমাকে সবদিক থেকেই সাহায্য করেছিলেন। পড়াশোনার জন্যে, ফার্ম করতে হলে কী কী করতে হবে। বেশিক্ষণ থাকতাম না, খুব বেশি হলে আধা ঘণ্টা। একবার কী হলো আমি পাঁচদিনের জন্যে শাফায়াত আহমেদের বাসায় যেতে পারিনি।

"কেন, কী হইছিল আপনের?" রহমত জানতে চায়।

"তেমন কিছু না। আমি আবার সাহিত্যচর্চাও করতাম একটু। মানে লেখালেখি না, পড়তে খুব পছন্দ করতাম। তো আমি একটা বই পড়তে শুরু করেছিলাম যেটার নাম হচ্ছে 'প্যারাডাইস লস্ট'। খুবই চমৎকার একটা ঘটনা নিয়ে লেখা। যিনি লিখেছেন তার নাম হচ্ছে জন মিল্টন।"

"কত যে কঠিন কঠিন কথা কইতাছেন আপনে কিছুতাই বুঝি না।"

"আচ্ছা। এখন থেকে চেষ্টা করব তোমার মতন করে বলতে। এই বইটি উনি কখন লেখা শেষ করেছেন জানো। উনার বয়স যখন উনষাট বছর তখন। আটচল্লিশ বছর বয়স থেকেই তিনি পুরোপুরি অন্ধ। মুখে ডিক্টেট করেন, আর তাঁর মেয়ে লাইনগুলো কাগজে লিখে রাখে। গল্পটা কী নিয়ে জানো। হজরত আদম আলায়হিসসালাম এবং বিবি হাওয়াকে নিয়ে।"

"এইটা মুসলমানদের লেখা?"

"না। ওটা একটু অন্যরকম ছিল। হজরত আদম আলায়হিসসালামের নাম ছিল অ্যাডাম আর বিবি হাওয়ার নাম ছিল ঈভ। শয়তান কী রকম চক্রান্ত করে তাদেরকে বেহেশত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে এনেছিল সেটাই ছিল আসল ঘটনা। তো আমি ওই পাঁচ দিন ধরে ক্লাসের পর বাসায় এসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বইটা পড়তাম। তখন তো আর মোবাইল ছিল না এখনকার মতন। তাই শাফায়াত স্যারকে কোনো খবর দিতে পারিনি। পাঁচ দিন পরে যখন গেলাম...

'আদম-হাওয়ার গল্পটা আরেকটু কন না।'

আরেক দিন বলব। আগেই তো বলেছি পাঁচ দিন পরে ওই বাসায় গেলাম। তখন তার মেয়ে মানে সুমনা আহমেদ খুব কড়া করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন–

"এ কদিন আসেননি কেন?" আমি একটু অবাক হয়ে বললাম–

"একটু কাজে ব্যস্ত ছিলাম।" আমি বসার পরে সে জিজ্ঞেস করল–

"কী এমন কাজ?" আমি একটু থতমত খেয়ে গেলাম। বললাম–

"প্যারাডাইস লস্টটা একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলাম। তার মধ্যে তো ক্লাস আছে। বুঝতেই পারছেন।"

"ও আচ্ছা, আপনি গল্প উপন্যাসও পড়েন নাকি? আমি তো ভেবেছিলাম আপনি পড়াশোনা ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না। বসুন আমি বাবাকে ডেকে দিচ্ছি।" আমার সাথে কথা বলার সময় খুব অবাক হয়ে খেয়াল করছিলাম তার চোখ ছলছল করছে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় মনে হলো সে কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছে। সেদিন শাফায়াত আহমেদের সাথে কথা বলার পর যখন চলে আসব তখন সুমনা আহমেদ বললেন–

'আপনি একটু বসুন। আপনার সাথে আমার কথা আছে।" ইতিমধ্যে আমি জেনে গিয়েছিলাম যে সে ইতিহাসে মাস্টার্স পড়ছে।

ড্রইংরুমে বসে সেদিনের পত্রিকা নাড়াচাড়া করছিলাম। সুমনা আহমেদ এসে সামনের সোফায় বসলেন। আমার দিকে সরাসরি না তাকিয়ে ঝাঁঝালো ভদ্রমহিলাটি ছলছলে চোখে কী বললেন জানো? বললেন–

"ইভকে না দেখতে পারার কষ্ট একদিনও না সইতে পেরে অ্যাডাম স্বর্গ ছেড়ে দিতে পারে, আর আপনার পাঁচ দিনেও আমাকে দেখতে হচ্ছে করল না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী বলব বুঝতে না পেরে আমি আমতা আমতা করে বলতে গেলাম "না মানে আমি ঠিক ওভাবে–"আমাকে থামিয়ে দিয়ে সুমনা আহমেদ কড়া চোখে আমার দিকে তাকিয়ে খুব নিচু গলায় বললেন–

'ব্যালেন্স শিটের অঙ্ক মেলাতে পারেন, কিন্তু ইতিহাস বানাতে পারেন না।"

আমার মনে হলো ঘরে যেন বজ্রপাত হলো। চারদিক আলোয় ভরে গেল।

"তারপরে কী হইল খালুজান?" নোমান চৌধুরী একটু হাসলেন।

"এরপর? এরপর আর কী হবে বলো। যা হবার তাই হলো। আমি পড়ালেখা শেষ করলাম। সেও পড়ালেখা শেষ করল। আর এই বাড়িতেই তাকে নিয়ে প্রথম উঠেছিলাম।"

"বিয়া না কইরা?"

"আরে ধুর, কী যে বলো! ধুমধাম করে বিয়ে করে আমার স্ত্রী হয়ে সে এসেছিল–এখন এগুলো সব ইতিহাস হয়ে গেছে। তোমার খালাম্মা যেমন ইতিহাস হয়ে গেছেন ঠিক তেমন।"

"এইসব কিতা কন। খালাম্মা ইতিহাস হইব কেন। উনি গেছেন মাত্তর তিন বৎসর হইল। মানুষ মানুষরে মনে রাখলে কেউ কি আর ইতিহাস হয়? আপনে তো সব সময়ই তার কথা কন।"

"হ্যাঁ বলি। আমার কাছে সে ইতিহাস হয়নি। কিন্তু অন্য সবার কাছে সে ইতিহাসই হয়ে গেছে।"

"এই কতা কেন কইতাছুইন খালুজান?"

"বলছি, তার কারণ আছে। আমার দুই ছেলে চায় আমি যেন আমেরিকায় ওদের সাথে থাকি। আর এই বাড়ি যেখানে কত স্মৃতি, কত ইতিহাস জমে আছে, সেটা অন্যের হাতে তুলে দিতে চায়।"

"কার কাছে?"

"কারো কাছে নয়। কিছু কিছু লোক আছে তারা বড় একতলা-দোতলা বাড়ি ভেঙে সেটাকে পাঁচ-ছয়তলা করে। সেটা তখন একটা বাড়ি থাকে না, অনেক বাড়ি হয়ে যায়। এই এত গাছ, এত সুন্দর ফলের বাগান কিছুই আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকবে না। তার বদলে এখানে বিশটা বাড়ি হয়ে যাবে। ঠিক বিশটা না, আরেকটু বেশি হতে পারে। কারণ আমার এই বাসাটা এক বিঘা পাঁচ কাঠার ওপরে।" রহমত মিয়া অবাক হয়ে শুনতে থাকে।

"আপনার পোলারা চায় এইগুলা, নাকি বউয়েরা?"

"তা তো ঠিক জানি না। তুমি তো দেখেইছ আমার বড় ছেলের স্ত্রী বাংলাদেশী মেয়ে। তবে ছোটটা বিয়ে করেছে একজন ব্রিটিশ মেয়েকে।"

"হ, ছুডোডাই তো মেম বিয়া করছে। পুতুলের লাহান সুন্দর।"

"আচ্ছা রহমত মিয়া তুমি হলে কী করতে? ওরা বলে কেউ যখন দেশে থাকবেই না তখন অযথা এত বড় বাড়ি রেখে লাভ কী। বাসা ভেঙে নতুন ফ্ল্যাট হলে তারা ওগুলো বিক্রি করে দিতে চায়। শুধু একটা বড় ফ্ল্যাট থাকবে যদি ওরা কখনো দেশে আসে তখন সেখানে থাকার জন্য।" রহমত মিয়া দেখে নোমান চৌধুরীর চোখ পানিতে ভরে যাচ্ছে।

"আমি তো এত কতা বুঝি না খালুজান। তবে আমি যদি আপনের পোলা হইতাম আমার মন কয় আমিও তারার লাহানই কইতাম। আর আমি যদি আপনে হইতাম তাইলে খুব জোর কইরা কইতাম–এইডা আমার বাড়ি। এহন এইটা দিয়া কিছু করতে পারবা না। আমি মইরা গেলে তোমাগো যা খুশি তাই কইরো।"

"ভালোই বলেছ রহমত মিয়া। ও আচ্ছা, তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে ভুলে গিয়েছি।" নোমান চৌধুরী তার বিছানার পবশের সাইড টেবিলের ওপরের ড্রয়ারটা খোলেন। সেখান থেকে একটা চমৎকার কালো ভেলভেটের বক্স বের করেন।

"দেখো তোমার পারুলের জন্যে আমি কী কিনেছি।" তিনি বাক্সটা খুলে চওড়া একটা গলার চেইন বের করে রহমতকে দেখান। রহমত মিয়া হতভম্ব হয়ে যায়।

"এইটা কি সোনার?"

"হ্যাঁ, অবশ্যই সোনার। আমি কি তোমার পারুলকে নকল কিছু দিতে পারি। এই চেইনটার ওজন দু ভরি।"

"আল্লাগো আল্লা! কিতা কইরছেন? আপনে দেহি আজিব মানুষ। এইটার দাম কত খালুজান?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"দাম শুনে কী হবে বলো। নাও এটা তোমার কাছে রেখে দাও।"

"না খালুজান আপনের কাছেই রাখেন। আমি যহন বাড়িত যামু তখন নিমু আপনার কাছ থিকা।" বলেই সে নোমান চৌধুরীর পা ছুঁয়ে সালাম করে।

"আরে করো কী করো কী! দাঁড়াও, আরেকটা জিনিস আছে। ওই দক্ষিণ দিক থেকে ওই প্যাকেটটা আনো তো।" রহমত মিয়া একটা পলিথিনের প্যাকেট এনে দেয় নোমান চৌধুরীর হাতে। নোমান চৌধুরী খুলে দেখান। লাল টকটকে একটা বেনারসি শাড়ি।

"এটা পারুলের জন্য।" রহমত মিয়া কী বলবে বুঝতে পারে না। মনে হচ্ছে সে স্বপ্ন দেখছে। তার চোখে পানি চলে আসে।

"খালুজান, আপনার মইনডা অনেক বড়।"

"কী যে বলো রহমত মিয়া। তুমি যখন প্রথম আসো আমার সব কাজ তুমি করতে। বেডপ্যান নিয়ে আসতে, সেগুলো নিজের হাতে পরিষ্কার করতে। কোনোদিন দেখিনি তুমি ঘৃণায় নাক কুঁচকিয়েছ। এসব ঋণ কি শোধ করা যায়?"

"হের জন্যে তো আপনি আমারে বেতন দিছেন।"

"বেতন দিলেও এরকম মানুষ পাওয়া যায় না সব সময়। আমার ছেলেরাও তো ছিল কিছুদিন। কই তারা তো কখনো আমাকে পরিষ্কার করতে আসেনি।"

রহমত মিয়ার এই বয়স্ক ভদ্রলোকের জন্যে খুব মায়া হয়। এত ধন সম্পদ অথচ কী ভয়ানক রকমের একা একটা মানুষ। সে শুনেছে সামনের মাস থেকে উনি নিয়মিত অফিস করবেন। তখন আর রহমতকে তাঁর নাও লাগতে পারে। কিন্তু মাঝেমধ্যেই তার মনে হয় বাকি জীবনটা এখানেই কাটাতে। টাকাপয়সা সে চায় না, শুধু যদি পারুলকে নিয়ে এখানে থাকার একটা ব্যবস্থা করতে পারত, তাহলে সে এই মানুষটাকে ছেড়ে কোথাও যেত না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয় দিন পর অয়নকে বাসায় আনা হয়। জন্ডিস ধরা পড়েছে—ডাক্তাররা হেপাটাইটিস বি থেকেই সেটা হয়েছে বলে মনে করছেন। হেপাটাইটিসের সবচেয়ে দুরারোগ্য ফর্ম। রোগটা অনেক আগে থেকেই শরীরে লুকিয়ে ছিল। কিন্তু একবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে খুব দ্রুত দখল করে নিয়েছে সারা শরীর। কথাও বলতে পারে না ঠিকমতন। মুখ দিয়ে অস্পষ্ট একটা গোঙানির শব্দ শোনা যায়।

নোমান চৌধুরী একটা ছেলেকে রেখে দিয়েছেন অয়নের দেখাশোনা করার জন্য। সে আবার খাওয়া-দাওয়া করে দোতলায়। সপ্তাহখানিকের মধ্যেই অয়ন অস্পষ্ট করে কথা বলতে শুরু করে। তবে কাউকে তেমন চিনতে পারে না। কিংবা পারে, তীব্র অভিমানে সে হয়তো না চেনার ভান করে। তার শূন্য দৃষ্টি দেখে বাসার সবাই প্রচণ্ড কষ্ট পায়। নাজমা বেগম আসেন। মাঝে মাঝে এসে ছেলের পাশে বসেন। কিন্তু বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারেন না। ভেজা চোখে উঠে চলে যান নিজের ঘরে।

নীলাদ্রি পাবলিকেশন্সের মালিক ওসমান সাহেব বারবার ফোন করতে থাকেন ইমতিয়াজ রহমান (অয়ন)-কে। ফোন বেজে চলে, কিন্তু কেউ ফোন ধরে কথা বলে না। বইটা কম্পোজ হয়ে গেছে এখন প্রুফ দেখা দরকার। কী করবেন বুঝে পান না তিনি। শেষ পর্যন্ত ইমতিয়াজ রহমানের আশা ছেড়ে তিনি নিজেই বসে যান প্রুফ দেখতে।

ফেব্রুয়ারির বইমেলায় আরো অনেকের সঙ্গে একজন নতুন লেখকের বই বের হয়। নাম—ভোর হয়, তবু ভোর হয়। মেলায় আসা পড়ুয়া এবং সাহিত্যিকেরা বেশ আগ্রহ নিয়েই বইটি কেনেন। অদ্ভুত! বইটির ভেতরে কোথাও লেখকের কোনো ছবি নেই। লেখকের সম্পর্কেও তেমন কিছু লেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই। বইটির ওপরে একটা কাগজে ডক্টর মনসুর চৌধুরীর লেখাটি আছে। হয়তো সে কারণেই বইটি লোকজন উল্টেপাল্টে দেখছে এবং কেউ কেউ কিনেও নিয়ে যাচ্ছে। অনেকেই লেখকের কথা জিজ্ঞেস করেন। বইটির প্রকাশক, ওসমান সাহেব তেমন কিছু বলতে পারেন না। প্রায় আন্দাজেই উনি বলেন–

"লেখক এখন খুবই অসুস্থ। তাই আসতে পারছেন না। কোনো মন্তব্য থাকলে আমাদের কমেন্ট বুকে লিখে দিয়ে যান। তাঁর কাছে আমরা পৌঁছে দেব।"

লেখককে না পেয়ে পত্রিকার রিপোর্টাররা অগত্যা ওসমান সাহেবেরই ইন্টারভিউ নিতে থাকে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশি বাসার এই গুমোট পরিস্থিতিতে থাকতে পারে না। সে বাসা থেকে বের হয়ে পড়ে। যাবার আগে নাজমা বেগমের টেবিলের ওপরে একটি চিঠি রেখে যায় আর মাকে বলে–

"মা, একটা কাগজ আছে তোমার টেবিলের ওপরে, পড়ে দেখো।"

রাত গভীর হতে থাকলে নিশির বাড়িতে ফেরার কোনো নামগন্ধও না দেখে নাজমা বেগমের চিঠিটার কথা মনে পড়ে যায়। ওটি খুলে পড়তে আরম্ভ করেন তিনি–

AMARBOI.COM

"মা,

চিঠিতে যে কথাগুলো লেখা সেগুলো মুখেও বলা যেত। তবে একটু নাটকীয় হয়ে যেত বোধ হয়। তাছাড়া আমি গুছিয়ে কথাও বলতে পারি না। তুমি আমাদের সব ভাই-বোনকে ছোটবেলা থেকে পড়া পড়া বলে প্রচণ্ড চাপ দিয়েছ। ডাক্তার হতে হবে, ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে–কানের কাছে এগুলো শুনতে শুনতে বড় হয়েছি। তোমার হয়তো অনেক স্বপ্ন ছিল। কিন্তু বাবা-মায়েদের স্বপ্নগুলো কি ছেলেমেয়েদের ওপর চাপিয়ে দেয়া ঠিক? আমি ভাইয়া কিংবা মিতুনের মতন না। তোমার কথা কখনোই শুনিনি। তার জন্যে তোমার মারও খেয়েছি অনেক। কিন্তু ভাইয়ার জীবনটা তুমি নষ্ট করে দিয়েছ।

তোমার কি মনে আছে আমি যখন ক্লাস টুতে পড়ি তখন দিদামণির সঙ্গে কোথায় যেন গিয়েছিলাম। সেখানে একটা নাচের অনুষ্ঠান ছিল। আমি দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। বাসায় ফিরে তোমাকে বলেছি–মা আমি নাচ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিখতে চাই! তুমি বলেছ ওগুলো বড়লোকেরা শেখে। আমি তারপরেও তোমার কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান করেছি। আর তার ফল হিসেবে দুটো চড় খেয়েছি তোমার হাতে।

মুনিয়াকে তো চেনো। ছোটবেলায় আমরা একই স্কুলে পড়তাম। মুনিয়ার মা, অর্থাৎ আন্টি তোমাকে অনুরোধও করেছিলেন আমাকে নাচের স্কুলে দেওয়ার জন্যে। তুমি তাকে বলেছিলে পরে দেখা যাবে। মুনিয়ার বাসায় একজন ওস্তাদ এসে ওকে নাচ শেখাতেন। সপ্তাহে দুদিন—শুক্র আর শনি। তুমি বুঝেছিলে নাকি বোঝনি তা জানি না, আমি কিন্তু প্রায় প্রতি বৃহস্পতিবারই মুনিয়ার বাসায় রাতে থেকে যেতাম। ওর মা বলত তাই। আমি কিন্তু তখন থেকেই ওর সাথে নাচ শিখতাম। স্কুলে আর কলেজের প্রায় অনুষ্ঠানেই নাচের জন্যে আমাদেরকে ডাকা হতো। টিভিতেও কয়েকবার আমার নাচ দেখানো হয়েছে। তুমি তো বধূবরণ আর কিরণমালা ছাড়া কিছু দেখো না। তাই তোমার চোখে পড়েনি।

মুনিয়া এখন ডাক্তারি পড়ছে। পড়াশোনা নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকে। তা বলে নাচটা কিন্তু ছাড়েনি। আমিও মুনিয়ার মতন কিংবা ভাইয়ার মতন মন দিয়ে পড়লে হয়তো ডাক্তারি পড়তে পারতাম। কিন্তু আমার ডাক্তার হওয়ার কোনো স্বপ্ন ছিল না।

আর একটা কথা তোমাকে বলি মা, আমি ফেসবুকে একটা লেখা দেখেছিলাম। যেখানে একজন টিচার তার অল্পবয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে একটা চিঠি লিখেছিলেন। কারণ তার কিছুদিন পরেই ওদের বড় একটা পরীক্ষা হবার কথা ছিল। চিঠির পুরোটা আমার মনে নেই। যেটুকু মনে আছে সেটুকুই লিখছি। তিনি তার একজন ছাত্রকে ডেকে চিঠিটি পড়তে বলেছিলেন যেন ক্লাসের সবাই শুনতে পায়। সেখানে লেখা ছিল—

'আমি জানি আর দু সপ্তাহ পরেই তোমাদের পরীক্ষা। এই পরীক্ষাগুলো কিন্তু তোমাদের সব কটা গুণের পরীক্ষা নয়। যারা এই পরীক্ষাগুলো তৈরি করেন তারা তোমাদেরকে জানেন না বা চেনেন না। বিশেষ করে আমি যেমন করে তোমাদের জানি। তারা জানে না যে তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে দুটো ভাষায় কথা বলতে হয়, কেউ কেউ খুব চমৎকার গাইতে পারো, কেউ অসাধারণ ছবি আঁকতে পারো। তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানেন না তোমাদের কেউ কেউ কী অসাধারণ নাচ জানো, কেউ কেউ এত চমৎকার করে হাসতে পারো যে হাসি শুনলে অন্যদের মনের সব দুঃখ দূর হয়ে যায়। তোমাদের মধ্যে কেউ আছো খুবই লাজুক, কেউ কেউ ছোট বোনকে সাথে নিয়ে ঘরে ফেরার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকো। তারা জানেন না তোমাদের কারো কারো মনটা কতটা উদার, বিশ্বস্ত আর চিন্তাশীল।

তোমাদের সবার মধ্যেই এসব গুণের একটি না একটি আছে। এই পরীক্ষা দুটোর রেজাল্ট তোমাদের সম্পর্কে কিছুটা বোঝাবে, কিন্তু সবকিছু না। তাই আমি তোমাদের বলছি এই পরীক্ষায় ভালো করা মানেই যে তোমরা সবচাইতে স্মার্ট এবং ভালো না করলে একেবারেই অযোগ্য তা কিন্তু নয়। এই পরীক্ষার মাধ্যমে তোমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অতুলনীয় ক্ষমতা আছে তার পুরোটা বোঝা যাবে না। কাজেই মনে রেখো এসব পরীক্ষার ফলাফলে তোমাদের মাঝে যে অসাধারণ আর অচিন্তনীয় গুণ আছে সেগুলো বের হয়ে আসবে না। আমি তোমাদের শুধু এটাই বোঝাতে চাচ্ছি যে তোমাদের ভেতরে যে গুণাবলিগুলো আছে সেগুলো যেন না হারায়। আমি তোমাদের অনেক ছোটবেলা থেকে জানি। তাই তোমাদের ওপর আছে আমার প্রচণ্ড বিশ্বাস।"

মা, তুমি কি কিছু বুঝতে পারছ এর থেকে? তুমি কি জানো মিতুন খুব চমৎকার ছবি আঁকে? প্লিজ মা, ও খুব নরম মেয়ে, তোমার সঙ্গে ও পেরে উঠবে না। ওকে ওর মতো বড় হয়ে উঠতে দাও মা।

এখন বলি রাহাতের কথা। মুনিয়ার বড় ভাই রাহাত আমার চেয়ে তিন বছরের বড়। সে একটি বিদেশি কোম্পানিতে কিছুদিন আগে জয়েন করেছে। আমাদের পরিবার সম্পর্কে ওদের পরিবার অনেক আগে থেকেই জানেন। ছোটবেলা থেকে নয়, বছর তিনেক হলো আমি আর রাহাত দুজন দুজনের খুব কাছাকাছি চলে এসেছি। ও আমাকে বিয়ে করতে চায়। এতে আমার কোনো অমত নেই। ওদের পরিবারেরও কোনো আপত্তি নেই। আমি আপাতত মুনিয়াদের বাসাতেই থাকব। তবে এই মুহূর্তে আমাদের দুজনের কেউই বিয়ের কথা ভাবছি না। যার সবচেয়ে কাছের মানুষ, বড়ভাইটা প্রায় পঙ্গু হয়ে সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকে, একসময় যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ছিল তাকে এ অবস্থায় রেখে আমি কি বিয়ের কথা ভাবতে পারি? কিন্তু এ বাড়িতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে মা।

মা, কেন ভাইয়াকে দেখাশোনার জন্যে একটা ছেলে লাগবে? তুমি কি পারো না এই কাজগুলো করতে? আমি কিন্তু পারব। কিন্তু আমার কলেজের জন্য সারাক্ষণ তার সাথে থাকতে পারব না। আমি যে ওর জন্য কিছু করতে পারছি না এটা যে কত কষ্টের তোমাকে বোঝাতে পারব না আমি। তুমি বোধ হয় খেয়াল করোনি মা, আমি যখন বাসায় থাকি তখন ভাইয়ার কাজগুলো আমি নিজের হাতেই করার চেষ্টা করি। তুমি রাগারাগি না করলে আমি এখানে সপ্তাহে অন্তত দু-একদিন থাকব। তাছাড়া তুমি ফোন করলেই আমি চলে আসব। তখন আমরা দুজনে মিলে ভাইয়ার সেবা করব। ফিজিওথেরাপিস্ট তো প্রতিদিন আসছেনই। আমি জানি সোনাদাদু আমাদের সমস্ত খরচের ভার নেবেন।

আমরা দুজন যদি ভাইয়ার পাশে দাঁড়াই আমি নিশ্চিত জানি ভাইয়া সুস্থ হয়ে যেতে বাধ্য। বিশ্বাস করো মা আমি একটুও বানিয়ে বলছি না। যদি তুমি আমার কথা রাখতে পারো তাহলে আমাকে ডেকো। আমি সঙ্গে সঙ্গে চলে আসব।

তোমার নিশি।"

নাজমা বেগম চিঠিটা আঁকড়ে ধরে চেয়ার থেকে ধীরে ধীরে মাটিতে বসে পড়েন। চোখের সামনে তাঁর সমস্ত জীবন ভেসে যেতে থাকে।

স্বামীকে তিনি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন নি কখনো, বিকল্প হিসেবে রাশ টেনে আগলে রাখতে চেয়েছেন পরিবারের আর সবাইকে। কিন্তু নিজেকে কখনো পুতুল নাচের দলের অধিকারি হিসেবে ভাবেন নি তিনি। এক জীবনের দুঃখ জোর করে অন্য জীবনের সুখে বদলে দেয়া যায় না, একথা আজকের আগে তিনি বুঝতে পারেন নি।

AMARBOI.COM

বাড়ির মালি জালাল মন দিয়ে সূর্যমুখীর শেষ ঘেরটার পরিচর্যা করছিল। গেট খুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ওপরে উঠতে গিয়ে লিনিয়া থমকে দাঁড়াল।

"সোনাদাদু ওপরে আছেন জালাল চাচা?"

একটু হকচকিয়ে গিয়ে জালাল উত্তর দিল–

"হ, বড়সাব উপরেই আছেন। একটু আগে অয়ন ভাইজানরে দেখতে নিচে নামছিলেন। হেরপর অন্য কোনো জায়গায় যাইতে দেহি নাই। বাগানটা কেমন ঝিলিক মারতাছে, দ্যাখছেন মা?"

জালালের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে প্রতি লাফে দুই সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে আসে লিনিয়া। নোমান সাহেব নিজের ঘরেই পায়চারি করছিলেন। হাঁটু ছেঁড়া জিনস, টপস আর কাঁধে রাকস্যাক ঝোলানো মেয়েটিকে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকতে দেখে থতমত খেয়ে যান তিনি।

"আমি দুসপ্তাহের জন্যে নেপাল-ভুটান গিয়েছিলাম সোনাদাদু। মার কাছ থেকে তিন দিন আগে অয়নের কথা জানতে পেরেছি। এর আগের কোনো ফিরতি ফ্ল্যাইট পাইনি। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা এখানে এসেছি দাদুমণি। এখনো বাড়িতে যাইনি। ও এখন কেমন আছে?" এক নিঃশ্বাসে বলে ওঠে লিনিয়া।

"দম ফেলে নে মা। ওকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসেছি। এখন অনেকটা ভালো, কিন্তু ওর যে রোগ সেটা–," কথা আটকে যায় নোমান সাহেবের।

"আমি শুনেছি, দাদুমণি। শোনার পর থেকে ইন্টারনেট তোলপাড় করে রিসার্চ করেছি। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, সবকিছু শেষ হয়নি এখনো। অন্তত আমি বেঁচে থাকতে নয়।" লিনিয়ার চোখ ঝলসে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ওর বইটা বের হয়েছে, জানিস? লোকে অনেক প্রশংসাও করছে। কেবল এ সবকিছু ও বুঝতে পারছে কি না জানি না...।"

"শুনেছি, আমি শুনেছি দাদুমণি... আর ভেবেছি আমার মতো নির্বোধ এই পৃথিবীতে আর কেউ আছে কি না। রাস্তার ওপাশটাতে থাকলেই কেউ পর হয়ে যায় দাদুমণি? ভিনদেশে গেলেই কেউ ভিনদেশী হয়ে যায়? আকাশ তো একটাই দাদুমণি, তাই না?"

"শেষের দিকটায় যখন আমার মন খারাপ হয়ে যেত, তখন সে আমাকেই প্রবোধ দিত কী বলে জানিস? বল তো সোনাদাদু, জেন অস্টেন নিজের নামে প্রথম দিকে বই ছাপতে পারেননি, তুমি মন খারাপ করছ কি জন্যে? পলো কোয়েলো তো চল্লিশ বার চেষ্টা করেও পাবলিশার না পেয়ে ইন্টারনেটেই বই রিলিজ করেছেন। জীবন অনেক বড় সোনাদাদু। হ্যাঁ মা, জীবন একটাই, আকাশও একটাই।"

দরজা পেরিয়ে করিডোর দিয়ে হাঁটতে থাকে লিনিয়া। সোনাদাদু তাকে অনুসরণ করতে থাকেন। সিঁড়ির গোড়ায় থমকে ফিরে দাঁড়ায় লিনিয়া–

"আমার মতো নিরেট আর মূর্খ আর কেউ নেই সোনাদাদু। একটা মানুষ দিনের পর দিন টেবিল টেনিসের টেবিলে নিজেকে হারিয়ে আমাকে কেন জিতিয়ে দিচ্ছে, এ কথা একবারের জন্যেও আমার মাথায় আসেনি। আমি অন্তত একবার ওর কাছে হারতে চাই, দাদুমণি...।"

জালাল মালি সূর্যমুখীর ঘেরের পাশে দাঁড়িয়ে মুখ হাঁ করে জীবনে প্রথমবারের মতো লিনিয়াকে দরজা ঠেলে অয়নের ঘরে ঢুকতে দেখল। কিছুক্ষণ পর সংবিৎ ফিরে এলে আর একবার গুন গুন করে গান ধরল সে–

"চিন্তারাম দারোগা বাবু জামিন দিল না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রহমত মিয়া, নোমান চৌধুরী দুজনেই দুপুরের খাবার খেয়ে নিয়েছেন। চারদিকটাতেই একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা। এ সময় সবাই দুপুরে খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে কিংবা একটু ঘুমায়। কিন্তু নোমান চৌধুরীর ঘুম আসছে না।

"রহমত মিয়া, তোমার ঘুম পাচ্ছে?"

"না খালুজান। কিছু কইবেন?"

"হ্যাঁ। তোমার খালাম্মাকে নিয়ে একটা মজার গল্প আছে। শুনবে?"

"কন। শুনুম।"

"তোমার খালার দেশের বাড়ি বগুড়া। বিয়ের পরপর আমরা দুজন বগুড়াতে যাই। সঙ্গে তার ভাইও ছিল। মোনার গা ভর্তি ছিল নানান রকম গয়না। বিয়ের পর প্রথম যাচ্ছিল তো তাই। ওখান থেকে আমরা তাদের গ্রামের বাড়িতে যাই একদিনের জন্য। রাতে আমরা দুজন ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। তখন ওখানে ইলেকট্রিসিটি ছিল না। একটা হারিকেন টিমটিম করে জ্বলছিল। তার মধ্যেই দেখলাম জানালার রড দুহাত দিয়ে বাঁকিয়ে একটা লোক ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল। তার হাতে কিছু একটা আছে মনে হলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলাম—চোর চোর! চোর এসেছে বাসায়। লোকটা বের হবার আগেই বাসার সবাই হারিকেন, টর্চলাইট নিয়ে আমার দরজায় ধাক্কা দিল। আমি এক লাফে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। চোর লোকটি মনে হয় এরকম পরিস্থিতিতে কখনো আগে পড়েনি। সে গরাদ গলিয়ে বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তার আগেই সব লোকজন তাকে ঘিরে ফেলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি দেখলাম কুচকুচে কালো একটা লোক, হাতে একটা দা। চিৎকার-চেঁচামেচিতে আশপোশের বাড়ির লোকজনও জেগে উঠেছিল। মোনার বাড়ির লোকজন চিৎকার করে বলতে লাগল—"আরে! এইটা তো মনসুর চোরা। ধর ধর, মনসুর চোরারে ধর সবাই।"

রহমত মিয়া কিছু না বলে খুব মনোযোগ দিয়ে চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল।

"সবার সাথে সাথে আমিও বলে উঠলাম—ধরো ধরো, চোরকে ধরো। ওর হাতে দা আছে।"

তারপর নোমান চৌধুরী হাসতে হাসতে বললেন—

"চোররা যে এত ভীতু হয় তা আগে জানতাম না। আশেপাশের সব মানুষেরা আমাদের বাসায় ঢুকে পড়েছিল। তাদের মধ্যে থেকে বেশ কয়েকজন বলল—ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও। ও অল্প স্বল্প চুরি করতে এসেছিল। দা দিয়ে কিছু করতে আসেনি। বাকিরা বলল—না, এবার ওকে ছাড়া যাবে না। ওর যন্ত্রণায় থাকা যায় না। কিছুদিন পরপর এসে চুরি করে। সঙ্গে আবার দা। দেখ দায়ে ধার আছে কিনা।

চোরটা বারবার বলছিল—কসম খোদার! আমার প্যাটে ভাত নাই বইলা চুরি করতে আসছিলাম। আমার দায়ে কোনো ধার নাই। এইটারে আমি সঙ্গে রাখি নিজের প্রাণের জন্যে আর অন্যরে ভয় দেখানোর জন্যে। মোনার ভাই আর গ্রামের কিছু অতি উৎসাহী মানুষ মিলে তাকে থানায় নিয়ে গেল।"

দীর্ঘক্ষণ পর রহমত মিয়া বলল—

"তারপর, তারপর কী হইছিল?"

"থানার পুলিশরা ওকে চিনত। আরো কয়েকবার ধরা পড়েছিল। তবে ছেড়ে দিয়েছে। সে আসলেই চুরিই করতে এসেছিল। দাটা ছিল লোক দেখানো। ওটা দিয়ে কিছু কাটে কিনা সন্দেহ। কিন্তু যেহেতু তার হাতে দা ছিল এবং সে আমাদের ঘরে ঢুকেছিল তাই আমরা সবাই মিলে মামলায় অ্যাটেম্পট টু মার্ডার-এর ধারা বসিয়ে দিলাম।" বলতে বলতে হাসছিলেন নোমান চৌধুরী। "এ ঘটনা আমি ভুলতেই পারি না। আমি আর মোনা যে কতবার হাসাহাসি করেছি।"

"হেরপর কী হইল খালুজান?"

"এরপর কী হয়েছে তা তো জানি না। আমরা তো ভোরের আলো ফোটার আগেই ঢাকার দিকে রওনা দিয়ে দিয়েছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রহমত মিয়া হঠাৎ উঠে দাঁড়াল এবং নোমান চৌধুরীর খুব কাছে এসে রূঢ়কণ্ঠে বলল–

"আমি জানি হের পরেরটা। শুনতে চান?" কথা বলতে বলতে সে থরথর করে কাঁপছিল। মুহূর্তে সে দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়ে কিচেন থেকে একটা ছুরি নিয়ে এল। নোমান চৌধুরী হতভম্ব হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"মনসুর চোরা খালি চুরিই করত আর বাসায় থাকত। খাওনের টাকা শেষ অইলেই খালি চুরি করত। তয় দা সে রাখত যাতে অন্য মানুষ তারে ভয় পায়। হে কোনোদিন নিজে থিক্কা একটা পিঁপড়াও মারে নাই।"

রহমতের দুই চোখ কয়লার মতো গন গন করছিল, একটু বাতাসেই জ্বলে উঠবে যেন। কিন্তু সেখান থেকে গড়িয়ে পড়ছিল জল।

"হের বউ তখন পোয়াতি আছিল। কিন্তু তারে খুনিদের লগে রাইখা দিছিল আফনেগো আত্মীয়রা। হে তো খুনি আছিল না, কিন্তু অন্যরা ব্যাকেই খুন কইরা জেলখানায় ঢুকছে। তাগো লগে আমার বাপে পারে নাই। অগরই হাতে খুন হয় মনসুর চোরা। ছয়দিনের মাথায়। আমার মায় তহন গেরাম ছাইড়া তার নানির ভিটা মমিনসিং-এর টিপরা গ্রামে আইয়া পড়ে"–রহমত চিৎকার করে বলতে থাকে।

নোমান চৌধুরী ভয়চকিত স্বরে বলেন–

"আমি জানতাম না, সত্যিই আমি কিছু জানতাম না।" রহমত মিয়ার হাতে ছুরি দেখে তিনি সত্যিই ভয় পেয়ে যান। "তুমি আমাকে মেরো না প্লিজ, তুমি আমাকে মেরো না।"

"আমি চুরও না, খুনিও না। কিন্তুক আইজকা আমারে আপনি খুনি বানাইলেন। মনসুর চোরার জানের বদলা আইজকা আমি লমুই।"

এক পা, এক পা করে এগিয়ে আসতে আসতেই রহমতের চোখ যেন কেমন ঝাপসা হয়ে গেল। গ্লানি মুছতে তার মাকে পোয়াতি অবস্থায় টিপরা গ্রামে চলে আসতে হয়েছিল। কিন্তু মতি কোথায় যাবে? তাকে কে নিয়ে যাবে?

মৌন দুপুরে বিশ্রী অস্বস্তিদায়ক একটি শব্দ হলো। চিৎকার করে আর্তনাদ করে উঠল কেউ একজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নোমান চৌধুরী ছুরি দেখে ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলেন। চোখ মেলে দেখলেন আর্তনাদটি আর কারো নয়, রহমত মিয়ার। ধবধবে সাদা টাইলসের মেঝেতে রহমত মিয়া পড়ে আছে। ছুরিটা তারই বুকে লাগানো। লাল রক্ত ঘরের মেঝেতে গড়িয়ে গড়িয়ে মাকড়সার জালের মতন নকশা তৈরি করেছে।

নোমান চৌধুরীর মনে হলো এই জালটাতে আষ্টেপৃষ্ঠে আটকে গেছেন যেন। না চাইতেই, অলক্ষ্যে তিনি বিড়বিড় করে বললেন–

"এ কেমন শাস্তি তোমার রহমত মিয়া? তুমি কেন আমাকে মারলে না?"

পরাজিত সৈনিকের মতন জীবনে প্রথমবারের মতো তিনি হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

রক্তের ধারা চৌকাঠ পর্যন্ত পেরুল না। এ পাশটাতেই থমকে থাকল। তখন বাইরে দুপুর ফিকে হয়ে আসছিল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃতজ্ঞতা

কর্নেল ড. তোরাব মল্লিক ও ড. ওয়াসেক আলী খানকে—

পেশাগত ব্যস্ততার প্রাবল্যের মধ্যেও তাঁদের চিকিৎসাশাস্ত্রীয় জ্ঞান এই অর্বাচীনকে ধার দেয়ার জন্য ;

ড. নোভা আহমদ ও ড. আরসাদ চৌধুরীকে—

প্রথম পাঠকের বিরক্তিকর কিন্তু প্রয়োজনীয় কাজটি অনেক আদরে সম্পন্ন করার জন্য;

সাদিয়া ইসলাম বৃষ্টিকে—

আমার বিচ্ছিন্ন চিন্তাগুলোকে কম্পিউটার স্ক্রিনে পরম ধৈর্যে তুলে আনার জন্য;

এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনিকে—

ডেডলাইন রাখতে ব্যর্থ হবার পরও প্রকাশক হিসেবে আমার ওপর আস্থা না হারানোর জন্য;

ও আফতাব আহমদকে—

নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও হাসিমুখে আমার অফুরন্ত অনুযোগ আর আবদার মেনে নেওয়ার জন্য।

গুলতেকিন খান

ঢাকা,

বাংলাদেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~